শারদীয় ১৪২৯

স্বজন

Swajan of Great Lakes

THE MULLICK FOUNDATION

The Mullick Foundation is a private family foundation based in Saline, MI.

The Mullick family has been supporting causes close to their heart for years. Prior to the formal formation of the foundation, they would come across issues in the community, friends in need, or stories about strangers seeking assistance, and do their part to help.

The Mullick Foundation was formed in May 2011 as an avenue to continue philanthropic endeavors as a family for many years to come.

VALUES

We believe that making a difference for even a handful of people will motivate them to do the same one day.

We believe in giving people a chance at opportunities they may otherwise not have.

We believe in our communities.

AREAS OF IMPACT

WASHTENAW COUNTY

Giving back to the community where we live and work.

INDIAN COMMUNITY

Promoting and supporting Indian people, organizations, and culture as a whole.

YOUTH / EDUCATION

Providing young people with greater access to education and opportunities to grow.

mullickfoundation.org

শারদীয় স্বজন

চতুর্দশ বর্ষ । ত্রয়দশ সংখ্যা

১৪২৯ । ২০২২

Swajan of Great Lakes, Michigan, USA

FREE REGISTRATION
($75 VALUE)
(WITH THIS COUPON)

MATH ENGLISH CODING

bestbrains
LEARNING CENTERS

THE DIFFERENCE OF BEST BRAINS

- Certified teachers
- Customized academic plans
- Creative & Analytical skills
- Low student-to-teacher ratio
- Non-repetitive approach
- Ongoing free assessments

Novi 248-329-0000 | Canton 734-275-0000 | Farmington/W Bloomfield 248-483-0000

www.bestbrains.com 248-329-0000

Compliments from

Nails & Hammer

Turnkey solution for your
Kitchen, Bath & Home renovation
From Design —> completion

You Relax! We'll slog!

Nails & Hammer LLC

734-219-8674

www.nailshammer.com email: nails.hammerofmi@gmail.com

শারদীয় স্বজন

চতুর্থ বর্ষ । ত্রয়দশ সংখ্যা

১৪২৯ । ২০২২

পত্রিকা সম্পাদক

রুদ্র সেন, দেব বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক

স্বজন অফ গ্রেট লেকস
মিশিগান, উত্তর আমেরিকা

প্রকাশনা উপসমিতি

কুন্তল বিশ্বাস, সেলভি রায়চৌধুরী, জিষ্ণু সেন,
সুললিতা চাকী, সোহিনী ঘোষ

প্রচ্ছদ

তনিমা বসু

শেষ প্রচ্ছদ

রোহিনী সেন

আলোকচিত্র

দেব বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজয় চৌধুরী

মুদ্রণ

শীর্ষেন্দু রায় ফোটোগ্রাফি

কলকাতা

গঠন

অনুশ্রী ব্যানার্জী, নিওস্পেকট্রাম, অস্ট্রেলিয়া

কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgment)

Swajan Of Great Lakes thanks all the contributors for their kind donation and support

Norma, Ashish, Alicia, Monica and Jay Sarkar

- Selvi, Sanjib, Shria, Shriti & Ayushi Roy Chowdhury
- Kuntal, Tania, Urshita , Urvi Biswas
- Lalitha Misra, Ajay, Pragya, Divya, Jaya Choudhury
- Arpita, Aniruddha, Ayush & Ashmit Deb
- Dipika, Santanu Neha & Nisha Ray
- Rituparna, Subrata, Srija Mahanta
- Debalina, Krisanu and Diya Bandyopadhyay
- Sujata, Abhijit Sarkar

- Kisa, Babu, Sreemona, Sreyan & Shinjan Bandyopadhyay
- Sujata, Abhijit, Anirban Sarkar
- Sampa, Sandip, Sohan & Sampoorna Sarkar
- Ananya, Anirban, Naiya & Arko Sarkar
- Piki, Ranajit, Ishita & Ishan Ghosh
- Jhumpa, Pritam, Pritisha, Priyan Sarkar
- Fanny Raina, Joy Duttagupta & Praneeth
- Namita, Bhanu, Ankan and Arpan Bhattacharya
- Abhijit, Mahua Ghosh
- Sandip, Soma Mukherjee
- Dr Amit Ghosh
- Jayeeta, Jishnu, Ritom and Shyam Sen
- Nancy Raina
- Mithun, Preeti and Aapratim Bhowmick
- Abhijit and Anamika Dastidar
- Sadhan and Sumi Mahanta
- Debashish, Suchitra and Udayan and Udita Ray
- Vishnu and Anushree Shankar
- Dr. Subrata and Indira Sarkar
- Binoy, Monidipa Mollick and Vihaan Das
- Rajesh, Sayanti , Rishik and Siya Choudhury
- Dipakshi Pal, Chayanika Pal and Dipankar Pal

মুখবন্ধ

সুললিতা চাকী

"আশ্বিন এর মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি, পূজার সময় এলো কাছে" – আশ্চর্যজনক ভাবে পাঁজি মিলিয়ে এই আশ্বিন মাসেই ৮০০০ মাইল দূরেও আকাশ হয়ে ওঠে অসামান্য নীল আর বুকের মধ্যে কান্না মেশা আনন্দ-বাজনা বাজতে থাকে – সত্যি "পূজার সময় এলো কাছে"। "ইন্ডিয়ান গ্রাস" নামক আমাদের কাশ ফুলের জাত ভাইরা এদিক সেদিকে প্রবল আন্দোলনে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এই সময়টাতেই। শত কাজ, শত ব্যস্ততার মাঝেও, পুজোতে যাওয়া আর তুমুল আনন্দ করার সেই মহা মূল্যবান সময়টুকুর জন্যই সম্বৎসর প্রত্যেকে আমরা মুখিয়ে থাকি। বলাই বাহুল্য সেই আনন্দক্ষণ দ্রুত ফুড়ুৎ করে পার হয়ে যায় আর, অবিচ্ছেদ্য বিচ্ছেদ-এ মন ভারী হয়ে ওঠে। কিন্তু আবাহন আর আগমনের আগে বিচ্ছেদের বাণী শুনবো বা বলবো-ই বা কেন ! অতএব সকলে সম্মিলিত হয়ে শুভ শারদীয়ার জন্য এগোই, স্বজন-এ, একযোগে। শক্তিময়ী, দীপ্তিময়ী, স্নেহময়ী মাতৃমূর্তিকার সামনে দাঁড়িয়ে অন্তরের অঞ্জলি দিই এবং প্রার্থনা করি যেন পৃথিবী মুক্ত হয় সকল অসুস্থতা আর অশুভ থেকে। সামনের পুজোর কদিন হাসি, গান, নির্ভেজাল আড্ডাতে, ধুনুচির গন্ধে আর মা-এর মঙ্গল প্রদীপের অত্যুজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করে তুলি আমাদের অন্তর্যাপনকে – সকলে যেন পাই শান্তি, হয়ে উঠি শুদ্ধ ও শান্ত এবং সম্পৃক্ত হতে থাকি মায়ের অবিমিশ্র করুণাধারায়। আনন্দধারা বহিতে থাকুক ভুবনে – এই আন্তরিক ইচ্ছা নিয়েই সকলকে আহ্বান জানাই "স্বজন" অর্থাৎ আমার আপনজনের মাঝে, আপন ঘরের উঠোনে, এক ঘরোয়া আনন্দ পরিবেশে মহা-আনন্দক্ষণে যোগ দিতে। জানাই শুভ শারদীয়া ২০২২।

Durgatsav is more of a heartfelt celebration than rituals itself and thus to us it is "Utsav" and is not bound by strict doctrines! "This time of the year" is here again and we are buckling up for our upcoming Durgapuja with luster of laughs, aroma of scrumptious food, fondness of close friends and families, striking hues of ethnic drapes and soulful offerings of our inner bhakti to the divine feminine posture that according to Hindu mythology had relentlessly and repetitively won the evil! We stand in front of HER with the hope to forever win over our inner demons that we face every day in our lives and thankfully remain able to keep the wholesome goodness alive! So Durgatsav is that occasion that brings us not only closer to our friends and families but to ourselves as well and that paves the pathway for the much needed introspection! Having that in mind, here in Swajan we all come together to spend Durgapuja with much fanfare! Its after all "Swajan" and who else could want to spend time together on such a festive occasion than with "my own", right?! So we expand our arms, we open our hearts, we pour our love and affection out to you to be with us during this year's Durgapuja! Even if we are far from home still, we are together here to celebrate this pious festivity that imbibes us all with strength, joy, kindness and peace! Subho Durgatsav 2022!

"Ashwin er majha majhi, uthilo bajna baaji, pujar somoy elo kaache" - aschorjo jonok bhabe panji miliye ei Ashwin mashei, 8000 mile dureo akash hoye othe osamanyo neel ar buker modhey kanna mesha anondo-bajna bajte thake sotti "pujar somoy elo kache". Indian grass namok amader kash phool er jaat-bhai ra edik e sedik e probol anodolon e matha chara diye othe ei somoy tatei. Shoto kaaj, byastotar majheo ei kodin Pujote jayoa and tumul anondo korar amader sei moha mulyobaan somoy jar jonnyo protyeke sombotshor mukhiye thaki. Bolai bahulyo, sei anondo-khon kon somoye druto phurut kore paar hoye gele, obicheddyo bicched e mon bhari-o hoye! Kintu abahon ar agomon er age bicched er baani sunbo ba bolboi ba keno! Otoeb asun sokole "subho sarodiya" r jonnyo egiye jaai. Swajan e, ekjog e. Shoktimoyee, Depptimoyee, Snehomoyee MA er saamne daNriye ontor er onjoli di, ebong prarthona o projotno kori jeno prithibi mukto hoy sokol osusthota or osubho theke. Saamner puja-r kodin hasi, gaan e, nirbhejaal addate, dhunuchir gondhe ar Ma er molgol prodeep er otyuojjowl alok-e alokito kore tuli amader ontorjapon ke sokole jeno pai shanti, hoye uthi sudhhu o shanto ebong somprikto hote thaki Ma er obimishro korunadharay! Anondodhara bohite thakuk e bhubon e - Ei antorik asha niyei sokolke ahobaan janai Swajan er pujote! Subho Sharodiya 2022 !

সম্পাদকের কথা

মুকুলের ঘুম আসেনা। কেরোসিন পোড়া আলো সুতির মশারি ছুঁয়ে দেওয়ালের চুনে আঁকে মরুছায়ালতা। সাদা পাতায় জমে ওঠে জন্মান্তরের মেঘ। সে সারারাত আঁকিবুঁকি কাটে। ভারী তরোয়াল, বর্ম আর হাতীঘোড়া। সে যুদ্ধ দেখেছে। সে দেখেছে সন্ধ্যে নামলে মরুকীটের দংশনে বালি কেমন লাল হয়ে ওঠে। লাল বালি ভোর রাতে জন্ম দেয় ক্যাকটাস।

সত্তরের দশকে সত্যজিৎ রায় যখন "সোনার কেল্লা" ছবি করলেন, তখন যে বইয়ের ডিটেকটিভ গল্পের ধরণটা যে বদলে দিচ্ছেন সে কথা তিনি লিখেছিলেন অজেয় রায় কে "গল্পকে একবারে ঢেলে সাজিয়ে মিস্ট্রি স্টোরির বদলে একটি কমেডি থ্রিলারে দাঁড় করিয়েছি"। এই কমেডি থ্রিলার তিনি বানালেন জটায়ুর আবির্ভাবের গল্পটিকে টেনে। সম্প্রতি সত্যজিৎ রায়ের জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হয়েছে। গত পঞ্চাশ বছরের প্রতিটি বাঙালি প্রজন্মের শিরা উপশিরায় এমন ভাবে তাঁর চিন্তনের, তাঁর চিত্রনাট্যের ফলগুধারা বয়ে গেছে যে পৃথিবীর প্রতিটি হাসি-কান্না প্রেম-বিদ্রোহের ঘটনায়। বার বার ফিরে আসে "কাঞ্চনজঙ্ঘা" থেকে "সোনার কেল্লা" র চরিত্রেরা। এবারও এলো।

আরও একটা বছর অতিবাহিত হল অস্বাভাবিকতায়। মহামারীর প্রকোপ কমে বাড়ে পারদের মতো। আরও একটা ভ্যারিএন্ট, আরও একটা নির্দেশিকা। ও আমাদের গা-সয়া হয়ে গেছে। কিন্তু যুদ্ধ? আবার সে ফিরে এলো। এবার মরুভূমি ছেড়ে শৈত্যে। তাই শীত ঘুম আমাদের নেই। পৃথিবীর উষ্ণতা যে বেড়ে চলেছে দিনে দিনে। উত্তাল সমুদ্রের আঁশটে জলোচ্ছ্বাস আমাদের পাড়ায়। তার গভীরতায় অবগাহনের সময় এসেছে। তাই কেরোসিন পোড়া আলো সুতির মশারী পেরিয়ে ছুঁয়ে দিলো আরও একটা প্রজন্মের ইনসমনিয়া। এভাবেই চলবো আমরা জন্ম থেকে জন্মান্তরে। ফাঁকে ফাঁকে সাদা কালোয় দেখা যাবে শরতের আকাশ। কাশবন ছুঁয়ে স্টিম রেল গাড়ি ।

আপাতত সাগরপারের আকাশ নীল। সোনা ঝরা রোদ্দুরের অভাব নেই। পাতা সবুজ থেকে হলুদের পথে। ধীরে ধীরে স্বজনের পুজোও ফিরে আসছে তার স্বমহিমায়। চেনা মঞ্চে আবার দেখা হবে বন্ধু প্রিয় জনের। মুচকি হেসে বলা যায় "পথে এবার নামো সাথী পথে হবে পথ চেনা"। দরজা খুলে, স্ক্রীন থেকে পথে নামার আশায় রয়েছি আমরা। "স্বজন" পত্রিকাতেও তাই আশার কথা। চতুর্থ বছরে বেশ কিছু নতুন মুখ। স্বজনের নবীন বন্ধু রুদ্র সেন ও সুললিতা চাকী পত্রিকায় কাজে এগিয়ে এসেছেন। নতুন লেখক লেখকেরা লেখা দিয়েছেন। পত্রিকাকে এমন অপরুপ সাজে সাজাবার জন্য সকলের কাছে আমরা ঋণী থাকলাম। এবারের অপূর্ব প্রচ্ছদটি তনিমা এঁকেছে। অতি মানবের মধ্যে মানুষের মতো মা। মা দুর্গার এই মুখশ্রী আমাদের চারপাশের মানুষরূপী দেবতাদের কথা মনে রেখেই প্রতিদিন আমাদের কাছাকাছি আসা চিকিৎসক, নার্স থেকে স্টোর ক্লার্ক, শিক্ষিকা সবাই। তারা হয়তো চুপকথা হয়ে আমাদের ড্রয়িংরুমের পর্দায় মিলিয়ে গেছে তবু এঁদের অতিমানবিক রূপ আমরা এই তিন বছরে উপলব্ধি করেছি। অসামান্য শেষ প্রচ্ছদটি এঁকেছে আমাদের রোহিণী সেন। যে মানুষটি ছাড়া এই পত্রিকা সম্ভব হত না, সেই অনুশ্রীদিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। পরিশেষে অশেষ ধন্যবাদ স্বজন সভাপতি কুন্তল, উপ-সভাপতি অনির্বাণ এবং স্বজন পত্রিকা উপসমিতির সদস্যদের। তোমাদের সাহায্য সব সময় পেয়েছি। শারদোৎসব সকলের আনন্দে কাটুক এই প্রার্থনা করি।

দেব ও রুদ্র
অ্যান আরবর, মিশিগান
অক্টোবর, ২০২২

Swajan Governing Body 2022-23

BOARD OF DIRECTORS

- Planner Committee
  - Principal Planner: Bhanu Bhattacharya
  - Senior Planner: Mousumi Talukder
- Audit Committee
  - Principal Auditor: Ajay Choudhary
  - Senior Auditor: Debashish Ray

BOARD OF OFFICERS

- Presidential Group
  - President: Kuntal Biswas

  - Vice President: Anirban Sarkar
- Secretarial Group
  - Prime Secretary: Twish Duttagupta
  - Joint Secretary: Devang Joshi
  - Cultural Secretary: Selvi Roychoudhury
  - Assistant Cultural Secretary: Mrinmoy Karmakar
  - Food & Hospitality Secretary: Rajesh Chowdhury
  - Associate Secretary Food & Hospitality: Binoy Das
- Treasury Group
  - Chief Treasurer: Sandip Mukherjee
  - "Not Elected"

Swajan Programme Item — 2022

9/30/22 FRIDAY	Gane O Kobitaay Pujo	Pathshala	**Ritu Mahanta & TEAM**	**8.30pm**
	EXTERNAL ARTIST		**FAKIRA BAND**	**9.00pm**
10/1/22 SATURDAY	Live band	Crosswalk	**Indranil Ray & TEAM**	**2.00pm**
	Dance	Natkhat Krishna	**The Sharika Group**	**3.00pm**
	Bollywood Dance	BaiSharAn	**Baishali Tikader & TEAM**	**3.55pm**
	Comic act	Bhat Mushaira	**Mithun Bhowmick & TEAM**	**4.15pm**
	Dance drama	Courageous journey presents CHUPKOTHARA	**Odyssey**	**4.30pm**
	Garba & Dandiya			**6.30pm**
	Presidents Address		**Kuntal Biswas**	**8.30pm**
	Bollywood Masti		**Saberi Bhattacharya**	**9.00pm**
10/2/22 SUNDAY	Songs		**Lalita Mishra**	**2.00pm**
	Drama	Choke Angul Dada	**Jishnu Sen & TEAM**	**2.40pm**
	Songs		**Subrata Mahanta & TEAM**	**3.30pm**
	Magic Show		**Preston Lyford**	**4.15pm**
	Sindur Khela & Dhunuchi Naach			**5.15pm**

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

সুললিতা চাকী 5

কবিতা

কলমচি কৌশিক	**রকমারি ছড়া**	27
অর্ফিউস মুখোটি	**সেই মেয়েটাই, 'মা'**	28
	ফেসবুকে	
	স্বার্থপর	
দেব বন্দ্যোপাধ্যায়	**কুয়াশা**	29
	প্রবাহ	
শুভ্র কান্তি গুপ্ত	**"দ্বিধাদ্বন্দ্ব"**	30
Anish Ghatak	**Heart On Fire**	31

গল্প

ডঃ উৎপল ভদ্র	**নিশ্চিন্দিপুরের শিকারিনী**	32
বিশ্বদীপ চক্রবর্তী	**ডিনার সেটিং**	43
	বিদ্যাসাগরের মাথা	45
	বিল গেটসের বিপদ	47
সৌগত ভট্টাচার্য	**তেল সংক্রান্তি**	48
রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়	**সরীসৃপের মৃদু স্বর**	53
মনোজ সরকার	**নবমীর-দ্বৈরথ**	58
Sneha Saha	**Durga Puja In The City of Lights**	86

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

সুললিতা চাকী	**শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন**	40
শ্রীপর্ণা মিত্র মজুমদার	**খাতার শেষের পাতা**	57

অনুবাদ

দেব বন্দ্যোপাধ্যায়	**এঞ্জেলের লণ্ঠ্রী**	60
	সাধারণ সুখ। নির্ভেজাল সুখ। প্যারিস রিভিউ। গ্রীষ্ম ২০১৮	73

গল্প ও প্রবন্ধ

মুনমুন ব্যানার্জী	**দামোদরের সঙ্গে মুণ্ডেশ্বরী-ফাউ** **মুণ্ডেশ্বরীর সঙ্গে মোলাকাৎ**	80

ভ্রমণ

Tanima Basu	**Where the Sky Meets the Earth**	83

চিত্রকলা

Jishnu Sen	26
Mou Mahanta	24

ছোটদের পাতা 23-25, 87

Rishik, Srija Rajini Mahanta, Sneha Rakshit, Pritisha Sarkar

President's Message

Dear All,

First, I would like to thank everyone for your support and help collectively to make this big event successful. I truly believe in Maa Durga's blessings for SWAJAN!! Our organization welcomes people and helps them get to the core of SWAJAN where we all belong !! We all have a common goal, which keeps us together when we need to support each other to bring our SWAJAN family together, make it stronger, and continue in the path of growth. My intention is to keep this momentum going and grow Swajan to a new dimension! I tried by best to perform my duties and always focused on Swajan's goal to achieve the same!

In 2021 we couldn't perform our Durga Puja with full strength due to the pandemic , but we tried our best and successfully executed our goals by defeating all evil forces with the blessings of Maa Durga!

This year, 2022, is the year we would like to show what Durga Puja means to a "Probasi"!

This year is not only a special year for all of us but a year where SWAJAN showed what we can do and achieve other than Durga Puja!! I am proud to be part of this team and journey.

Some of the achievements we started and accomplished in the last 6 months from March 2022 till date:

- **PATHSHALA:** A Bengali leaning class for everyone (not only kids)
- **Revived Raptors:** Made this brand stronger by doing fundraising for a cause and donate the money for needy people.
- **Free water distribution** at Canton Liberty Fest for Raptors
- **5K Walk** to raise funds for Raptors which will be donated to Vista Maria
- **Raptor Fundraising During Durga Puja:** Will be donated to Vista Maria too!
- **Introduced Fun Filled Holi Festival**
- **Swajan Cricket Team:** Led by Swajan lovers and members
- **Swajan Merchandise:** Designed and sold T-shirts in-house to raise funds
- **Developed brand new website** with new payment portal to **save money for Swajan**
- **Introduced online payment options for sponsors or donors**
- **Online magazine and online portal for sponsors**
- **Building a social media team to promote our events**

I hope we can continue our endeavor and SWAJAN will grow more in future.

I wish SWAJAN will have something of its own as permanent establishment where we can perform our future events! I truly believe this journey has just begun.

Last but not the least, I would like you all to enjoy and have fun this year Durga Puja with us. Wishing you all a happy and safe Durga Puja 2022!!

Kuntal Biswas
President, Swajan of Great Lakes
September, 2022

SWAJAN
of Great Lakes
SWAJAN INVITS YOU..
Durga Puja 2022
For any Enquiry
Call us at 248-916-7098
presidentofswajan@gmail.com
Visit us at : https://swajan-mi.org
Venue & Dates:
Towsley Auditorium
Washtenaw Community College
Three Day event
Friday Sept. 30th 6PM
Saturday Oct. 1st 8AM-Midnight
Sunday Oct. 2nd 8AM-8PM
Promotion Expires soon!!
RSVP and Durga Puja Details:
https://swajan-mi.org/archives/2438
Food Timings
Friday Evening
Dinner 6:30-8PM
Saturday/Sunday
Lunch 12-2PM
Saturday Evening
Snack: 5-530PM
Saturday Dinner
6:30-8:30PM
SUnday Dinner
6:00-8:00PM
Maha Sasthi
Friday 7-8PM
Maha Saptami & Pushpanjali:
Saturday 8:30-10:30AM
Maha Ashtami & Pushpanjali
Saturday 11:30AM-12:30PM
Sondhi Pujo: 12:30-1:15PM
Local Artist Performance
Saturday/Sunday 2-5PM
Sondha Aroti - Saturday evening 6PM-630PM
Maha Navami (Navratri)& Pushpanjali
Sunday 10:00AM-12:00PM
Debir Bisorjon and Boron (Dusherra)
Sunday 5:00PM-6:30PM
SWAJAN needs your help and support
You are welcome to Sponsor for:
Any day(Friday/Saturday/Sunday)
Puja Flower $100
Fruit Sponsor $100
Prasad Sponsor: $100
Lunch Sponsor: $250
Dinner Sponsor: $500
Call us at 248-916-7098 for details
RSVP Here
Food Menu
Raptors
Bengali Folk/Rock Band
Fakira
Friday Evening 830-10:30PM
Guest Artist Saturday Eve 9-11PM
Saberi Bhattacharya
(Indian Idol, Zee and Hindi Film Playback Singer)
Saturday Attraction:
Dandiya(630-7PM)
Sunday Attraction:
Sindur Khela and Dhunuchi naach
Sunday Evening 5-630PM
Sunday Evening
Mohan Singh! Dohl
& Swajan Dhak!!

YOUR RELIABLE REALTOR

PIYUSH DAVE

Ranked in Top 1% Realtors Nationwide!

Cell 734-620-2233

RESIDENTIAL

COMMERCIAL

INVESTMENT

IT'S YOUR FUTURE,

CALL THE EXPERT,

MAKE THE RIGHT MOVE!

Email - dave@pdave.com, Website - www.pdave.com

Cell - 734-620-2233

BROKERAGE WITH REAL ESTATE INE (734) 455 7000

Congratulations to Class of 2022 !!

Sneha (Tia) Rakhit graduated with 4.8 weighted grade point average in 2022 from Walled Lake Western, earning the Summa Cum Laude: the highest honors that Walled Lake Consolidated School District bestows to a student with GPA of 4.0, or more.

Right from her early childhood days, she cherished the vision to become an Engineer, a firm decision made after close job shadowing both parents, dad an engineer and mom a veterinarian. She received acceptance in eight universities, awarding prestigious scholarships: Merit and Dean Honor's. She opted admission to the Institute of her dreams, University of Michigan, Ann Arbor, College of Engineering. She participated in Varsity Swimming, Tennis, National Honor Society, Debate Team, Art Club, and was the President of her school's Girls' Engineering and Technology Club. She attended various summer technology-oriented camps during her entire high school tenure, and worked two jobs at Kumon (summer time) and later at Mathnasium.

Ashna Talukder, daughter of Mousumi Sarkar and Ashim Talukder attending University of Michigan, Ann Arbor, MI. Major: LSA, intending Public Policy

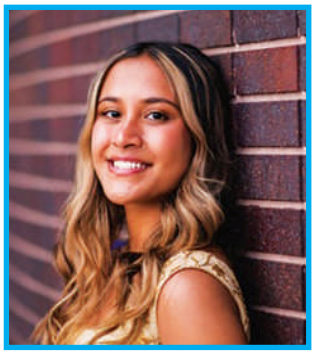

Nisha Ray Daughter of Deepika and Santanu Ray. Class of 2022 attending University of Michigan, Ann Arbor, MI. Major: Business. “It is ok to slow down and take a break. Your mental health and happiness is more important than anything else”.

Sreyan Bandyopadhyay, Saline High School Graduate, 2022.

Congratulations to Class of 2022 !!

Pragya Choudhary – Freshman in University of Michigan, Ann Arbor, "The best part about growth is that it isn't easy. It is challenging and confusing, which is as painful as it is rewarding. Don't run from the obstacles life throws at you. Face them with all the courage you can muster and you'll find that what seemed like hurdles are actually stepping stones into a brilliant future".

Ishan Ghosh – Northville High Grad – 2022. MSU – Computer Science.

Pic - Ajay Chaudhury

Social Media Team

Hi, my name is Suradip Mukherjee and I am a senior at Novi high school. I am a part of the social media team in swajan with my friends and it's a awesome experience. The Swajan community as a whole is like family and i'm glad I am a part of this team so i can give back to the community.

Hi I am Urshita Biswas. I am a junior at Northville Highschool. I am a member of the social media team and I currently work on Instagram and Facebook posts. I am so happy to be working first hand in spreading the message on Swajan and it’s events. I feel like everyone should be able to experience the joy we all do here in our Swajan Family!

Hi, my name is Ateendra Ghosh and I currently a Sophomore currently intending to major in Finance at Michigan State University. I am part of the Social Media Team, and I work on the Instagram and Facebook posts. Swajan has been a community which I have been part of most of my life, and I am happy to contribute back to this organization by spreading the word about our events to various current and new members.

Summer Event

Swajan has become a true fundraiser for deserving people in the world by organizing events like 5K Walk/Run during last summer. This was a successful event and we were able to Raise funds for Vista Maria which we will donate from the Swajan Raptors. Please request you to join us next year and help us support the community. It was a really refreshing morning with all fun and walking, we pledged to have more activity like this in future. We have received a donation from Mr. Piyush Dave who is a realtor and philanthropic person for the same event.

Summer Picnic

The Swajan Picnic is a an annual event where families come for aada, games, food and to share some laughter. From games to food everything is a enjoyable experience.We play volleyball, Cricket, musical chairs, badminton and many more games to make it feel like home. Anyone can come and enjoy this memorable experience. We serve authentic bengali food and the food is always hot and ready. There is also music where everyone can vibe to. We welcome people of all ages and background to come to this event and vibe with us and

Water Distribution Event at Canton Liberty Fest

Giving back to the community… That is one of the essential attributes Swajan of Great Lakes takes part in as a family through charity donations and fundraisers. During Canton's Annual Liberty Fest, Swajan donated more than 500 water bottles to fellow citizens participating in the carnival. A special thanks go out to the Swajan kids that helped out with this event including Raji, Urvi, Urshita, and Ankush. Additionally thank you to Binoy, Subrata, Jishnu, and our newest members Samik, Neha, and their child for donating their resources (water bottles, etc) and time which led to this event being successful.

Holi

In the midst of a cold early spring weather Swajan held its 2022 Edition of Holi. Despite the weather, our family members showed out with full energy and enthusiasm. With beautiful colors being spread around the park, it certainly felt like the colors of the spring season were coming in early. Friends chased each other with colors and smeared them from one side of the face to another. The laughter by the warm heater where many were huddled up by called for a moment to remember. Warm chai was passed around from one person to another. It was truly a moment where you could see the "family" environment between each member as everyone had lots of care for each other so no one would end up sick following the event. An assortment of Indian music was played throughout the day. One of them being everyone' favorite Holi song: Balam Pichkari. A day full of dance and memories concluded with warm biryani for all to settle down with. The smell of Indian spices filled the air as everyone gathered on their benches munching down on their food after the long day.

Dr. Ranajit Mukherjee

Dr. Rajanjit Mukherjee was one of the oldest members and doner for Swajan of Great Lakes. He will remain in our memories forever and will never forget his philanthropic contributions to the organization since its inception. We would like to convey our sincere respect and condolences to his family and will offer any support and help from our organization as needed.

Dr. Ranajit Mukherjee breathed his last on the mortal earth on September 8, 2021 at the age of 62 but his spirits are and will always soar high. He lives through his wife, daughter and mother all for whom, Dr. Mukherjee is omnipresent. His life was as exciting as his personality. Having graduated from Nilratan Medical College in 1986 and after a brief stay in Canada with his sister, made his niche as a renounced physician in Michigan. An Avid reader, an absolute connoisseur of art, music, good food and elite life style, Dr. Mukherjee led a life full of joy, humor, grit and passion. He is remembered for his strong personality and great hospitability. He had the capacity to relentlessly humor people of his life stories ranging all the way back to his childhood days and friends from Kolkata. With his passing to the next world, Michigan lost a caring, dedicated, top-notch physician. For his family and friends, the void is permanent. He, who led a life king-style, passed fighting, just like a king. May he continue to shine bright and live through his family. To all those who knew him, He still remains forever carved in their memories and hearts.

With heavy hearts Swajan remembers Mr. Karuna Bandyopadhyay, our beloved guardian of Bengali communities in southeast Michigan for more than five decades. He served as president of Mitali, a Bengali organization in Ann Arbor area. He supported countless activities, including conducting Puja rituals in Bichitra, Mitali and other Bengali communities in the area. Generations of Bengalis will miss him deeply.

Mr. Karuna Bandyopadhyay was a graduate of electrical engineering from the Calcutta University. He worked in IISCO in Burnpur for few years and taught at Hirapur high school for few years before moving to USA in 1971. We worked at Bechtel and DTE as Nuclear engineer in Detroit area. He left behind his beloved wife Mandira Bandyopadhyay, his son and son-in law Babu and Kisa Bandyopadhyay, grandkids Noel, Nirvan, Nishan, relatives and countless friends. Our thoughts and prayers are with Bandyopadhyay family. Swajan community pays their deep respect to Karuna-da.

Rabindra Jayanti — 2022

The 2022 Rabindra Jayanti was a joyous occasion where all of Swajan came together to celebrate the famous Rabindranath Tagore. The occasion was filled with various performances including brilliant dance and captivating song. Afterwards, there was fantastic food served for dinner. Most of the event was live streamed to the Swajan YouTube channel to great success. The video of that stream can be found in the link below.

https://youtu.be/141CoBvXP6g

Rishik

Srija Rajini Mahanta's paintings

Mou Mahanta

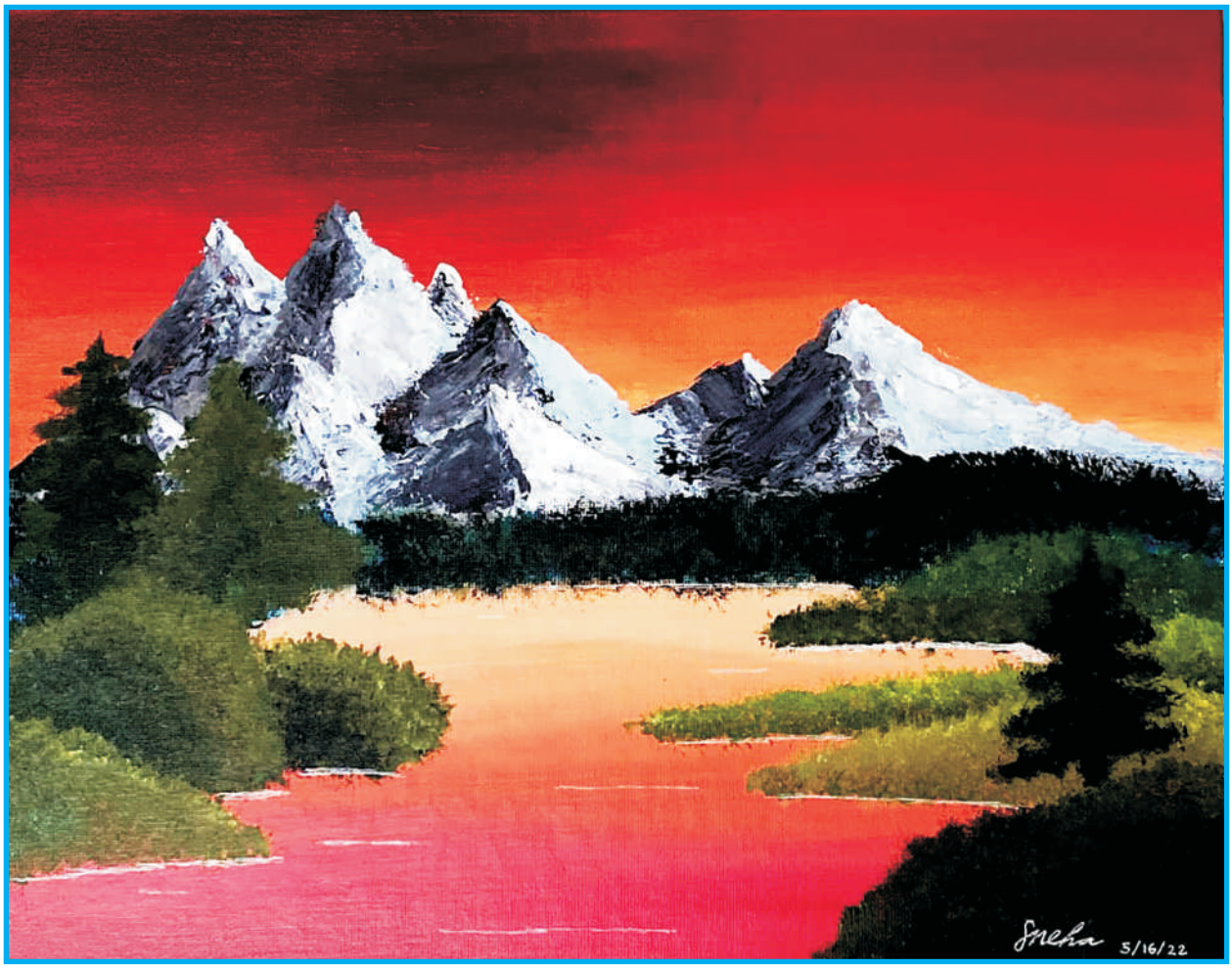

Sneha Rakshit

Loans
for the way
YOU
live.

Call me for more details:
248-202-7585

Residential Loan Programs

- Purchase, Refinance or Cash Out Refinance
- Construction Loans upto $1.5 Million
- Lowest rate in the market
- Non-Conventional Loan programs for those with
  - Low Credit score, lack of w2 income and tax returns
  - Personal Bank statement, no Income verification

Other Loan Programs

- Commercial Loan for any type of Business
- Vacant land loan for Residential

Hemanth
Hemakumar Balakrishnan
Mortgage Loan Officer (NMLS - 1901741)
hemanth@sistarmortgage.com
Licensed in CA, CT, GA, MI, TX, NJ, VA

Jishnu Sen

কলমচি কৌশিক

রকমারি ছড়া

ধরলে কলম হরেকরকম ছন্দ উঠে আসে
নানান রকম ছড়ার তোড়া ছড়িয়ে আশেপাশে।

কেউবা লেখেন শক্ত ছড়া, কেউবা লেখে নরম
কারোর ছড়া ঠাণ্ডা বেজায়, কারোর ছড়া গরম।

কেউবা লেখেন মিষ্টি ছড়া, কারোর ছড়া তেতো
কারোর ছড়া পোলাও যেন, কারোর ছড়া ভেতো।

কারোর ছড়া আটপৌরে, সুক্তোনি আর ডাল
কারোর ছড়া মশলাদার ও ভীষণ রকম ঝাল।

কারোর ছড়া জলের মতো, কারোর ছড়া আগুন
কারোর ছড়া বৃষ্টিমুখর, কারোর ছড়ায় ফাগুন।

কেউবা লেখেন ছন্দে ছড়া, কেউবা সেসব বিনে
অলঙ্কারের প্যাকেট আনেন বাজার থেকে কিনে।

কারোর ছড়া হালকা এতো উড়ছে তুলোর মতো
কারোর ছড়ার উচ্চ ফলন, ফলছে শত শত।

কারোর ছড়া খাতার পাতায়, বদ্ধ মনের ঘরে
কারোর ছড়া ছড়িয়ে পড়ে কালবোশেখী ঝড়ে।

কারোর ছড়া মন ছুঁয়ে যায় আলতো সুবাস নিয়ে
কারোর ছড়া যায় উড়ে যায় মাথার ওপর দিয়ে।

এমনতরো লিখছে সবাই, লিখছে রকমারী
তবুও আজও সেরার সেরা, ছড়ায় সুকুমারই।।

অর্ফিউস মুখোটি

সেই মেয়েটাই, 'মা'

একটা ছিল মেয়ে
জলপাই রং গা
অবুঝ একটা চাঁদ
আর একটা সন্ধ্যা !!
বহু বছর আগে
একটা নদী ছিল
খেলতে খেলতে মেয়ে
নদী পেরিয়েছিল
এত বছর পরে
সেই মেয়েটাই, 'মা'
নদীর বুকে জমা
সমূহ যন্ত্রণা
আমি তাকে চিনি
সেও চেনে আমায়
নদীর বালি মাখা
একটা হলুদ জামায়

ফেসবুকে

তুমি কে ?
সারাদিন মুগ্ধ করো আমাকে
বৃষ্টি হও, মেঘলা হও
আমার ডানা হও
বধির কবিকে
দু-দণ্ড শান্তি কি দিতে পারো না ?
আমার যৌবন কাটেনি এখনো
দগ্ধ ডানায় অক্ষত রেখেছি সভ্যতা
নিছক প্রেমের কথা বলতে গিয়ে
ফেসবুকে শরণাপন্ন হই মাঝরাতে
অথচ পাশাপাশি
সারাদিন
তোমাকে কবিতা শোনাতে চেয়ে
পাবলিক করে দিই আমার হাহুতাস
পাশাপাশি তুমি
কবিতা পড়ছো ফেসবুকে
এবার বুঝি লাইকও দেবে
আর আমরা ঘুমিয়ে পড়বো পাশাপাশি

স্বার্থপর

এই যে আবার এসে গেল বর্ষারা
জল থৈথৈ ভুবন ডাঙ্গার মোড়
এই বর্ষায় হাত ছুঁয়ে থাকা মানে
ঘোর কাটছে না এখনো বালিকা তোর

এই যে আমরা পাশাপাশি হাঁটতাম
এই যে দূরেই গড়িয়াহাটার মোড়
চটি ছিঁড়ে গেলে পায়ে হেঁটে চলে যাব
শ্রাবণ মাসেতে পবন করেছে শোর

সেই আমরাই আজকে অনেক দূরের
বৃষ্টি পড়ে না সকাল কি সন্ধ্যাতে
জেগে উঠি তবু দুজনেই বারবার
প্রবাসী শ্রাবণে বর্ষার মাঝ রাতে

আবার যদি প্রেমে পড়া যেত বল
কেমন হতো এই শ্রাবণের মাস
শুনেছি এখন মেয়ের হাতটি ধরেই
সন্ধ্যা বেলায় পার্কে বেড়াতে যাস।

দু চার পশলা, বৃষ্টিরা কেঁদে যায়
এই পৃথিবীর সব প্রেমরা পায় না ঘর
রাত জাগা তারা বৃষ্টিকে বলে দিল
অপ্রেমে থাক তুইও স্বার্থপর

দেব বন্দ্যোপাধ্যায়

কুয়াশা

নীলে ভেসে যায় এক ঝাঁক সাইবেরিয়ান সারস
তার নীচে স্তব্ধ পাখা, কেরানীর টেবিলে শীত
চায়ে তামাটে সরের প্রলেপ,
পেপারওয়েট। কাঁচের বুদবুদ। স্থবিরতা।
তারও নীচে চাপা ছিল স্বরলিপির পাতা খানি

হয়তো বা মালকোশ, অথবা হিন্দোল
হয়তো বা শ্রী, অথবা শঙ্করা
জটাজুটোয় জমে আসে মেঘ
তুষারশুভ্র শিখরেগর্ভে জন্ম নেয় প্রবাহ
গুহার অন্ধকারে জ্বলে ওঠে মশাল
চঞ্চল আলোয় দেখা যায় অবয়ব। ধ্বংসের দেবতা।
শিরশিখরে আকাশ, পদতলে পাতাল
মধ্যে নীলাভ গ্রীবার প্রসার

পশমের গোলা খুলে খুলে ফিকে রোদের খাম
শীতের পসরা, পাহাড়িয়া মেয়ের নাকের নোলক
গাঢ় কাজলের গায়ে সেই নীল এঁকে দেন ভীমসেন

কোলকাতা "ক" আসলে তেপান্তরের শীত
ছিল এক কুয়াশার নাম

প্রবাহ

বড্ডো গুমোট কদিন
ফ্যানের হাওয়া গায়ে লাগছে না
বস্তাবোঝাই ট্রাক, মিনিবাসের যাত্রী
সবাই দাঁড়িয়ে ।
নদীর হা-কঙ্কাল সার
শেষ বিকেলে পাঁজরে বাতাস লাগলে
চিক চিক করে ওঠে বালি
ঠিকরে বেরিয়ে আসে
ছেঁড়া জুতো, প্লাষ্টিক ব্যাগের জরা।
হয়তো চাঁদের উত্তর গোলার্ধে
বইছে টলটলে সকাল,
হয়তো কেউ ভাঙছে তালা,
সাদা চুনকামের নিচে
আবছা হয়ে আসছে দেয়াললিখন,
সেই গতবারের দেবীপক্ষে বন্ধ হয়েছিল
আমাদের চটকল,
তবু আজও কেমন যেন সচল
আগাছায় সরে সরে যায় সরীসৃপের প্রবাহ ...

শুভ্র কান্তি গুপ্ত

"দ্বিধাদ্বন্দ্ব"

শর্মিষ্ঠা –
কে তোমায় ভাবতে ব'লেছে
শতরূপ ?
দেখছো না চারিদিক
কি ভীষণ চুপ।
ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে
ঘুম নেই –
শতাব্দী প্রাচীন ঐ পাইনের
সারি –
পাহাড়ের ঢালে সমকোণে
আড়াআড়ি –
কি ভাবে রেখেছে ধ'রে
প্রযুক্তির শেষ বিন্দু দিয়ে ?
অসংখ্য, অগণিত ফুল,
রূপে রসে গন্ধে আকুল –
শুধু তো আবেগ নয় –
বিস্মিত করে –
নির্বিকার, নিশ্চুপ পাথরের
পড়ে থাকা –
নদীটির ধারে –
অথচ যখনই জল বাড়ে –
পাথরও সচল হয় –
পাথরও বিহঙ্গ হ'য়ে
কোন একদিন –
আকাশেতে ওড়ে –
চক্রাকারে আবর্তিত হয় –
জীবকের গল্প ম'নে পড়ে –
শতরূপ –
এজন্যই 'মন' বলি, শর্মিষ্ঠা
তোমায় –
যখনই নিভৃতে থাকি –
'মন' ব'লে ডাকি –
আসলে কেউই নয়
সম্পূর্ণ একাকী –
শব্দরূপ, ধাতুরূপ হয়তো
বোঝেনা –
তবু কত কথা বলে
ওদের ভাষায় –
সৃষ্টির আদিরূপে পাহাড়ে
জঙ্গলে বারোমাসই –
ভালোবাসাবাসি চলে –
পাথরও শিশুর ম'ত স্নান করে
ঝর্ণা ধারায় –
রোদ এসে গা মোছায়
যতটুকু পারে –
পাখিরাও গাছের কোটরে
বাসা বাঁধে –
রোদ, মেঘ, বৃষ্টি এসে খেলা
কোরে
যায় প্রতিদিন –
গাছ, ফুল, পাখিদের
ম'নকে ভোলায় –
শুধু দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে
চির অশান্তের দল –

Anish Ghatak

Heart On Fire

However hard a wall pushes her,
She'll push it back again,
Training against societal views,
She will rise again!

Ain't nothing called a fallen angel,
Wings of steel, can't be clipped,
She made some mistakes, but she learnt,
Nothing tells us that she slipped!

Brave face with streaked tears,
Personality as big as the shire,
She's a phoenix who shall rise again,
With her heart set on fire!

Climbing through the treacherous valleys,
Of stereotypes and blame,
Hard marble, or be it adamantium,
You'll find her chisel her name.

Shatter ceilings and scatter bones,
A battlefield of victory awaits,
Ignore the naysayers of yore and old,
With her, it's not a debate!

Don't underestimate her,
There's everything that she can!
She's a phoenix with her heart on fire,
She's a woman!

ডঃ উৎপল ভদ্র

নিশ্চিন্দিপুরের শিকারিনী

কাপোতাক্ষ নদীর মিষ্টি জলে দিন দুপুরে স্নান সারার জন্যে সবে মাত্র কাদম্বিনী ঠাকুরান নদীর পাড়ে বসে বেশ কিছু সময় ধরে রোদ পোহাচ্ছেন। শীতের দুপুর জলে নামার আগে একটু শরীরটাকে গরম করে নেওয়া। কাপোতাক্ষের মিষ্টি জলে মাছের লোভে কুমীরের ছড়াছড়ি। ছোট বড় সব রকমের কুমীরের বাস। এহান নদীতে স্নান সারতে যাওয়া এক ঝকমারি কাণ্ডও বটে। গ্রামের লোকেরা এতেই অভ্যস্ত। কুমিরের আক্রমণ থেকে বাঁচতে মোড়ল শশধর বনিকের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর সার দিয়ে এক বুক জলের নীচে বাঁশের সার সার খোপা লাগান হয়। যাতে কুমীর বাঁশের বেড়ার এ ধারে ঘেঁসতে না পারে। ঘাটের এক ধার দিয়ে সবেমাত্র খোটা লাগানো শুরু হয়েছে। বলা নেই কওয়া নেই এক মস্ত কুমির এসে এক কর্মীকে টেনে হিঁচড়ে জলের মধ্যে নিয়ে গেল। কথায় বলে "সুন্দরবনে ডাঙ্গায় বাঘ আর জলে কুমীরের সঙ্গে পেরে ওঠা ভার"। কুমীরের ল্যাজে ৬ মরোদের বল। যুবকটির শক্তি থাকলে কি হবে জলে কুমীরের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন ? কিছুই করার ছিলও না কুমীরের খাদ্যে পরিণত হওয়া ছাড়া। তাই হল। খাদ্যের টানে কুমীরের লোভ উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। গ্রামে সতর্কতা জারি হোল। বেশ কিছু দিন আগে একটা জলজ্যান্ত গরু নদীর পার থেকে ধরে নিয়ে গেল। কি আর করবে মানুষ বড় অসহায়। কুমীর গরুর মাংস খাবার অছিলায় গরুর একটা আস্ত ঠ্যাং ছুড়ে মারল জলের উপরে। লাগবি না লাগ সেই ঠ্যাং এসে লাগল কাদম্বিনীর পায়ে। আঁতকে উঠল কাদম্বিনী। ঘুমটা ভেঙে গেল। সে কি স্বপ্ন দেখছিল। হতে পারে। আধা ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানার উপর বসে পরল কাদম্বিনী। তার যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না। সে স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্নটার কোন সত্যতা নেই। সবই কাল্পনিক। ভাবতে ভাবতে মায়ের একটা কথা তার মনে পড়ল। অনেকদিন মায়ের সেই কথাটা মনে পড়ে একটা গর্ব তার বুকের মধ্যে অনুভূত হয়। মা বলতেন কাদম্বিনী রাতের পর রাত স্বপ্ন দেখেই চলে বটে কিন্তু এক ডাক সাইটে আর এক বজ্ঞা মেয়ে। সেই কথা ভাবতে ভাবতে শীতের রাতে গরম কম্বলের নীচে আরামে এক সময় সে আবার ঘুমিয়ে পরল শেষ রাতের দিকে।

সবে রোদের উত্তাপটা নিয়ে কাপড় গুঁটিয়ে জলে নেমেছে। সে দেখল মস্ত এক কুমীর বাঁশের বেড়া ভেঙে স্নানের জায়গায় ঢুঁকে পড়েছে। যারা সবে স্নান করতে নেমেছে পড়ি কি মরি সকলে দৌড়ে ডাঙ্গায় উঠল, পারল না কাদম্বিনী ঠাকুরান। জলের থেকে উঠতে যাবে কুমীরটি ঠিক কালান্তক যমের মতো হা করে দ্রুত এসে তার বাম হাতের কব্জির নীচে চাপ দিল। তার দাঁত দিয়ে হাতটাকে টুকরো করার জন্য এক অদম্য প্রয়াস। সেই অতীব কামড় সহ্য করার ক্ষমতা বা সাহস কাদম্বিনীর ছিল না। মুহূর্তে তার কব্জির উপরটা অবশ হয়ে এলো। ঠিক জ্ঞান হারাবার পূর্ব মুহূর্ত। নদীর জল কাদম্বিনীর রক্তে লাল হয়ে গেল। হাতের হাড় গুলো মুহূর্তে পাট কাঠির মতো ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেল। কুমিরটা খাদ্য পাওয়ার লোভে আকুলি বিকুলি করছে। তার হাতটা কুমীর চেপে ধরে আছে আর তাকে প্রাণপণে জলের মধ্যে নিয়ে যাবার জন্যে চেষ্টা করছে। চেষ্টা করেছে অনবরত লেজের ঝাপটা দিয়ে জলের মধ্যে ফেলার। কুমিরের সাদা দাঁতগুলো ফালা কাটা অস্ত্রের মতো তার হাতে চেপে বসেছে। ক্রমাগত চাপ দিয়ে চলেছে। এক অসহনীয় যন্ত্রণা। কিন্তু কাদম্বিনী সাহসের ও বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। সে নিজের পরনের কাপড়টা খুলে দলা করে ডান হাত দিয়ে কুমীরের মুখে ঠেসে ধরল। কাপড়ের দলা কুমীরের হাঁ টা আরও একটু বড় করে ধরল। আর সেই সুযোগে আহত হাতের উপর চাপটা হাল্কা হতেইই সে কুমীরের মুখ থেকে হাতটা কোনওরকমে বার করে কোনদিকে ভুরুক্ষেপ না করে ডাঙ্গার দিকে ছুট লাগাল। জলের সীমানায় কাদার চরে ভয়ে আড়ষ্টতায় কাদম্বিনী আঘাটায় পা বাড়াল। ঘাট আঘাটার বিচার করার ফুরসুৎ কোথায় তার ? আঘাটায় হাঁটু অবধি চরের কাদায় ঢুকে গেল তার পা। কিছুতেই আর ডাঙ্গার দিকে এগোতে পারছে না। এ দিকে পিছনে

কালান্তক যম রুপী মৃত্যুদুত কুমীরের হাতছানি। সর্বশক্তি দিয়ে কিছুতেই সে আর আঠালো কাদার মধ্য দিয়ে এগোতে পারল না। অগত্যা নদীর চরেই ঢলে পড়ল। গ্রামের দর্শককুল তারস্বরে চিৎকার করে চলেছে। সবাই চিৎকার করে বলছে "ঠাকুরান আর একটু এগোন, কিন্তু কে শোনে কার কথা ? কাদার চরের মধ্যে ঠিক জলের কিনারায় সে ঢলে পরল। কাদার কোলে মূর্ছা গেল। যখন সকলে দেখল কুমীরের আসার কোন সম্ভাবনা নেই তড়ি ঘড়ি সকলে ঠাকুরানের কাছে পৌঁছে তার জ্ঞান ফেরাতে সচেস্ট হল। কেউ আনল জল। কাদার উপর শোয়া মুখ খানিতে ঝাপটা দিতে শুরু করল। কেউ তার পোশাক আশাকের দিকে নজর দিল। অন্তর বাস ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বাকি সকলে তার বুকের উপর হাত দিয়ে সজোরে আঘাত করতে শুরু করল। যাতে অবশ্যই হৃৎপিণ্ডটা ফের সচল হয়। ঠাকুরানের জ্ঞান ফেরে। হৃৎপিণ্ডর আর দোষের কি? মুহুর্মুহু হাতের জোরাল ধাক্কায় অচিরে তার জ্ঞান ফিরতে বাধ্য। হাতের আঘাত এড়িয়ে হৃৎপিণ্ডটা আর কতক্ষণ নিশ্চুপ বসে থাকতে পারে। জ্ঞান ফিরতে বাধ্য। ফিরল বটে। জ্ঞান ফিরতেই সাত তাড়াতাড়ি কাদার উপর উঠে বসল। কিন্তু এ কি এতো কাদা নয়। নদীর চর তো নয়। নিছক তার নিজের বিছানা। বিছানায় কেন ? সে কি তবে স্বপ্ন দেখছিল। ধর ফর করে বিছানার উপর উঠে বসলো। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। সে স্বপ্নের মধ্যে আছে। গায়ে চিমটি কাটল, চোখ দুটোও রগড়াল, দু গালে হাত দিয়ে আলতো করে চড় কষাল। সত্যি তো এটা বিছানা বটে। স্বপ্নের পর স্বপ্ন অদ্ভুত ব্যাপার বটে। এ কোন ভাবুলতার সাক্ষী সে। সত্যি সে স্বপ্ন দেখছিল। ডান হাত দিয়ে বাম হাতের আঙ্গুল গুলো স্পর্শ করল। হ্যাঁ হাতটা ঠিকই আছে। নিছকই স্বপ্ন বটে। স্বপ্নটার কথা ভেবে ভয়ে তার প্রাণটা শুখিয়ে উঠল। স্বপ্নের ভয় যেন তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। শেষ অবধি, বিছানা থেকে নেমে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পান করল। ঠিক তখনি জানালা দিয়ে দেখল পুব আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে। রাতজাগা পাখিরা কিচির মিচির শব্দ করে গৃহস্তের ঘুম ভাঙাতে ব্যস্ত। সকালের স্বপ্নের কথা ভেবে ভয়টা আরও জাকিয়ে বসল। এই ভেবে "ভোরের স্বপ্ন সত্যি না হয়ে যায় না"। কিন্তু স্বপ্নের কথাটা কাউকে বলতে হবে তো। যাতে বাস্তবে না ফলে। শেষমেশ এক ঘটি জল সামনে পেয়ে। সেই বরুন দেবকে সবিস্তারে সব স্বপ্নের কথা জানাল। তাতেও ভয়টা কাটল না। সকাল থেকে ভয়ে বুকটা দুরু দুরু করে কাঁপতে লাগল।

বেশ কিছু দিন কাটল বটে, কিন্তু স্বপ্ন সত্যি হবার নাম গন্ধ নেই। ভয় সবে কাদম্বিনীর মন থেকে ফিঙ্কে হতে শুরু করেছে। কাদম্বিনী এখন স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় সবে অভ্যস্ত হতে শুরু করেছে। ঠিক তখনি ঘটল নিদারুণ বিপত্তি। স্বপ্নের ঘটনাটা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। একটুও বিচ্যুতি ঘটল না। বাস্তবে কাদার উপর শুয়ে শুয়ে জ্ঞান ফিরতেই কাদম্বিনী উঠে বসল। ঠিক যেন স্বপ্নের প্রতিফলন। সাহায্যাথীদের সাহায্যে ভর করে সে ডাঙ্গায় উঠে এলো। এদিকে বোকা কুমীর কাপড়ের ও মাংসের দলার মধ্যে কোন তফাত করতে না পেরে কাপড়ের দলাটা নিয়ে নদীর গভীরে তলিয়ে গেল। বহু দিনের শশ্রুষার ফলে কাদম্বিনী সুস্থ হল বটে কিন্তু কুমীরের মুখের চাপে কব্জির নীচে থেকে তার বাম হাতটা কেটে চিরতরে হারাতে হল। কব্জি বিহীন বাম হাতটা কাদম্বিনীর কাছে বিড়ম্বনা মাত্র। সব রকম কাজ থেকে তার বিশ্রাম, অবসান, চিরও বিশ্রাম। ক্রোমে ক্রোমে কাদম্বিনী এক হাতে সকল কাজে অভস্ত্য হতে শিখল। এটাই বুঝি বিধির বিধান। এক অস্বস্তির শৃঙ্খল স্বরূপ। তাকে মানিয়ে চলতে হবে এই পৃথিবীতে। কাদম্বিনী কিন্তু তাতে নাছোড়বান্দা। ছোট বেলা থেকে সে হল দৃঢ়চেতা, একবজ্ঞা একরোখা এক চরিত্রের। কোন কিছুতে তার দুর্বলতা, উৎকণ্ঠা যেন তার চরিত্রের এক বিপরীত ধর্মী ফল স্বরূপ। কিছুতেই চরিত্রের এই দুর্বলতা গুলো কে আমল দিত না। যা পরিকল্পনা করত তার বাস্তব রূপ দেওয়া ছিল তার নেশা। চরিত্রের পেশাও বটে।

বারে বারে কব্জি বিহীন বাম হাতটাকে হাত বোলাতে বোলাতে হাবে ভাবে তার দিন কাটে। কোন সুরাহা হয় না। মন বলে এর প্রতিশোধ চাইই চাই। প্রতিবাদ স্পৃহা তাকে দিনে দিনে কুরে কুরে খেতে থাকে। সেই প্রতিশোধ স্পৃহা সহস্র গুণ বেড়ে দাবানলের মতো তার বুকে চেপে বসে যখন এক পাল গ্রামের দামাল ছেলেরা তাকে "নুলো কাদম্বিনী" বলে ব্যাঙ্গ করে। সেই ব্যাঙ্গোক্তি তার প্রতিশোধ স্পৃহা কে বুকের মধ্যে পোষণ করে। বয়ে বেড়ায়। যে করে হোক নিশ্চিন্দিপুরকে কুমীরের ভীতি

থেকে নিশ্চিন্ন করতে হবে। নিশ্চিন্দি পুর যেন নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারে এই তার প্রতিজ্ঞা। কিন্তু করবে কি ভাবে ? কোথা থেকে শুরু করবে। যে করে হোক কপোতাক্ষকে কুমীর মুক্ত করতেই হবে। কালের টানে দিনগুলি এগিয়ে চলে কোন উপায়ান্তরের দেখা মেলে না।

সেদিন ছিল মাঘ মাসের অমাবস্যা। ঘুট ঘুটে অন্ধকার। নিশুতি নিপাট কালো মিশমিশে আঁধার দশ হাত দূরের লোকও দেখতে পাওয়া ভার। নিশ্চিন্দিপুর শ্মশানে আজ শ্মশান কালীর মস্তো পুজো। সারা গ্রামের কাছে এক মহোৎসব। তার আয়োজনও বড় কম নয়। প্রতি বছর পূজার আয়োজনের ভার বর্তায় কাদম্বিনী উপর। সেই থেকে সারা গ্রাম তাকে চেনে "ঠাকুরান" হিসাবে। আয়োজন বড়ো কম নয়। আয়োজন সারতে ফি বছর বেলা গড়িয়ে যায়। এবারের কথা তো আলাদা এক হাতে আয়োজন সারতে সারতে মধ্য রাত হবার দশা। ছোট্ট একটা হ্যাঁরিকেনের আলো ভরসা করে ঠাকুরান অন্ধকার রাস্তা দিয়ে মাঝরাতে বাড়ির পথে পা বাড়াল। বেশ কিছুদূর আসার পর পথের পাশ থেকে এক বাজখাঁই স্বর ভেসে এলো কাদম্বিনীর কানে। "কি ঠাকুরান বাড়ী চললেন বুঝি। এতো রাত্রে। এই রাতে একা একা যাওটা ঠিক না, কিনু সঙ্গে আছে ও যাক আপনাকে বাড়ী অবধি পৌঁছে দিয়ে আসুক"। আঁধারের মধ্যে কথার স্বর শুনে বোঝার উপায় নেই কে কথা বলছে। কোনওরকমে হ্যাঁরিকেনের আলোটাকে মুখ বরাবর তুলে কাদম্বিনী দেখার চেষ্টা করল। এ কি এ যে গ্রামের রহিম ডাকাত ও তার সাঙ্গ পাঙ্গরা দল বেঁধে চলেছে শ্মশান কালীর পুজোতে। বয়স হয়েছে তবু কি ছিপছিপে গড়ন, কিন্তু সুঠাম পেশিবহুল দেহ, ৬ ফুটের উপর লম্বা। কালো মিশমিশে গায়ের রং অমাবস্যার অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেছে বোঝার উপায় নেই। পরনে লাল রঙের ধুতি গায়ে লাল বর্ণের উত্তরীয়। এক মুখ লম্বা দাড়ি। গোঁফ পরিষ্কার করে কামান। হাতে তেল খাওয়া বাঁশের লাঠি। কাদম্বিনী হ্যাঁরিকেনের আলোয় ঠাওর করল চোখ গুলো রক্তজবার মতো লাল। পুজোর দিনে ভাং খেয়ে থাকবে। কপালে লাল রঙের সিন্দূরের টিপ। ঠাকুরান মৃদু প্রতিবাদ করে বলল "কিনু আবার কষ্ট করতে যাবে কেন ? এই টুকু তো পথ আমি একা একা ঠিকই যেতে পারব"। রহিম বলে উঠল "তা কি হয় আমরা থাকতে। অমাবস্যার রাত চারিদিকে ভূত প্রেতরা আকছার ঘোরা ঘুরি করছে।" কিছু প্রত্যুত্তরের আসা না করে, রহিম খান সাকরেদ কিনুকে বলল। "ঠাকুরানের হাত থেকে হ্যাঁরিকেনটা নে আর ওনাকে পৌঁছে দিয়ে আয়"। রহিম খানের কথা নড় চড় হবার নয়। যে কথা সেই কাজ। তার কথা অমান্য করে এমন সাধ্য কার ? কিনু সেখ দৌড়ে এসে কাদম্বিনীর হাত থেকে হ্যাঁরিকেনটা নিয়ে বলল "চলেন ঠাকুরান"। রহিম খান বলল "আমরা ধীরে ধীরে শ্মশানের দিকে এগোচ্ছি তুই ঠাকুরানকে দিয়ে পূজা মণ্ডপে চলে আয়"।

ক্লান্ত কাদম্বিনী বাড়ী পৌঁছে হাত মুখ ধুয়ে ঠায় কিছুক্ষণ ঘরের চেয়ার উপর বসে বিশ্রাম নিলো। ধকল বড় কম হয়নি সেই সকাল থেকে কাজ এক বিন্দু বসবার উপায় নেই। কালী পূজার সরঞ্জাম আয়োজন তো কম ঝকমারি নয়। ক্লান্ত হয়ে চেয়ারের উপরেই ঘুমিয়ে পড়ল। খানিক পড়ে ঘুম ভাঙলে চেয়ার থেকে উঠে মশারি টাঙ্গিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পরল। খাবার ইচ্ছা নেই ক্লান্তিতে বিছানা থেকে উঠার স্পৃহা নেই। ক্লান্তির কারণে কাদম্বিনী গভীর ঘুমে ঢলে পরল। শেষ রাতে। খুদার তাড়নায় এক বার ঘুম ভাঙল বটে। কিন্তু উঠতে ইচ্ছা হল না। আবার ঘুমিয়ে পরল। আবার সে তলিয়ে গেল স্বপ্নের আঙ্গিনায় মুক্ত এলোকেশী, দীর্ঘাঙ্গি, কালো এক উলঙ্গ মহিলা রুদ্রমূর্তি ধারণ করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। গলায় তাঁর মানুষের মুণ্ড মালা। কোমরে তাঁর একই প্রকার সাবেকি মুণ্ড মালা। মুণ্ড থেকে অনবরত রক্ত ঝরছে। এক দঙ্গল শিয়াল সেই রক্ত পান করার মানসে লোলুপ দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে আছে। একটু সুযোগ পেলেই তাঁর সদ্ব্যবহার করবে। শ্মশানকালীর রাগ ও রুদ্রটাকে প্রশমিত করার মানসে স্বয়ং মহাদেব আজ তাঁর যাত্রা পথে শায়িত। মায়ের এই রুদ্র রূপ সারা ভূখণ্ডকে লণ্ডভণ্ড করতে ব্যস্ত। তাঁর রুদ্র মূর্তির সামনে যারা পড়ছে মৃত্যু তাদের অবধারিত। মুণ্ড ছেদ এখন মায়ের নেশা। ডান হাতে তাঁর বিশাল খড়্গ সেই খড়্গ দিয়ে যাকে সামনে পাচ্ছেন তাঁর মুণ্ড ছেদ করতে উদ্যত। শ্মশানকালী বুঝি নেশাগ্রস্ত। বাম হাতে তাঁর সদ্য ছিন্ন করা মুণ্ড। তাঁর রুদ্র রূপে ভূখণ্ডে প্রলয় আসন্ন। ধরিত্রী লণ্ডভণ্ড হবার আশঙ্কা অবশ্যম্ভাবী। সেই রাগ প্রশমিত করার ও রুদ্রতা কমার

আশায় দেবাদিদেব যোগীবর আজ তাঁর যাত্রাপথে শায়িত। মায়ের রুদ্রতা তাকে এতোখানি সম্মোহিত করেছে মহাদেবের শয়ন তাঁর কাছেও ভ্রুক্ষেপ হীন। কোন দিকে দৃষ্টি দেবার তাঁর অবকাশ কোথায়। ভূখণ্ডকে ধ্বংস করার নিমিত্তে তিনি ছুটে চলেছেন। হঠাৎই তাঁর পায়ে অনুভূত হল মানুষের শায়িত দেহ। চোখ পড়তেই তাঁর নজরে এলো সে আর কেউ নন তাঁর স্বামী দেবাদিদেব যোগীবর মহাদেব। তাঁর মুখ খানি লজ্জায় কুঁকড়ে গেল। লজ্জারি প্রতিফলনে তিনি জিহ্বা বের করে ফেললেন। মায়ের রাগ ও রুদ্রতা প্রশমিত হল। ধরিত্রী নিস্তার লাভ করল। সেই মূর্তির সামনে কাদম্বিনী কায় মনোবাক্যে হাত জোর করে প্রার্থনা করে চলেছে কতো সময় প্রার্থনা করছেন তাঁর খোঁজ কে রাখে ? তবে দীর্ঘক্ষণ হবে সম্ভবত। সে দিকে কাদম্বিনীর ভ্রুক্ষেপ নেই। হঠাৎই মাটির মূর্তি জীবন্ত হয়ে কাদম্বিনীর সামনে ধরা দিল। শ্মশানকালী জানালেন – তুই বহুক্ষণ ধরে প্রার্থনা করে চলেছিস। আমি সন্তুষ্ট। কি তোর অভিপ্রায় জানা"। কাদম্বিনী শিহরিত হয়ে আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠল। "মা আমার কোন অভিপ্রায় নেই। অর্থ, সম্মান, সামাজিক প্রতিপত্তি, কিছুইই চাই না। শুধু তোমার প্রার্থনা করে যেতে চাইই"। মা বললেন "তা কি হয়, বল তোর কি উপকারে আসতে পারি। তখন কাদম্বিনী ডুকরে কেঁদে উঠে বলে উঠল। "মা কুমীরের অত্যাচারে আমার বাম হাত খানি আজ নেই। এক হাতে তোমার কাজ করতে বড়ই অসুবিধা হয়। মা আমাকে এই দিশা দাও যেন নিশ্চিন্দিপুরের কপোতাক্ষের জলকে কুমীর মুক্ত করতে পারি। মা কিছুক্ষণ ভাবলেন পরে বললেন "চামড়ার ব্যাপারী লুৎফরের কাছে যা সে তোকে কুমীর শিকারের পথের দিশা দেবে"। বলে সস্নেহে মা তাকে আলিঙ্গন করে ধরলেন। দেবতার স্পর্শ। দেবীর আলিঙ্গন কাদম্বিনী সারা দেহ রোমঞ্চিত হয়ে উঠল। মুহূর্তে তাঁর ঘুম কেটে গেল। একি সে আবার স্বপ্ন দেখছিল। ঠাকুরের সাক্ষাৎ তাও শেষ রাতে। এ স্বপ্ন সত্যি না হয়ে যায় না। বিছানাতে উঠে বসে দু হাত জোড় করে শুভ স্বপ্নের আগমনকে তারিফ জানাল। তাড়াতাড়ি মনে মনে ঠিক করল। স্বপ্নের কথা কাউকে বলবে না। যদি স্বপ্ন ভগ্ন হয়। সেই আশঙ্কায় ও ভয়ে তাঁর সারা দিন নাওয়া খাওয়া বন্ধ হবার জোগাড়। কালই সে লুৎফর রহমানের কাছে যাবে ঠিক করল। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। সকাল হতেই সে ছুটল লুৎফর রহমানের কাছে।

নিশ্চিন্দিপুর বেশ বড় গ্রাম। তার হাটের বেশ নামডাক। হাটের মাঝে চামড়ার ব্যাপারী লুৎফর রহমানের মস্ত বড় আড়ৎ। কিসের চামড়া নেই সে দোকানে। সাপ, ব্যাং ঘড়িয়াল কুমির ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বপনের কথা বরাবর সঠিক দিশা হিসাবে প্রথম পদক্ষেপে কাদম্বিনী রহমান ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করল। কিন্তু ঘুণাক্ষরে কাউকে স্বপ্নের কথা বলল না। নারী মন তো কথা কখনওই নিজের মধ্যে রাখতে পারে না। কিন্তু কি করবে শত কষ্টতেও কাউকে জানাল না। লুৎফরকে জিজ্ঞাসিল "তার আড়তে কি কি চামড়া আছে। কুমীরের চামড়া আছে কি ? কোথা থেকে সে সংগ্রহ করে। সে কি জানে কুমীরের চামড়া কিভাবে আনে। লুৎফর জানাল "কুমীরের চামড়া কিভাবে সংগ্রহ করে সে সঠিক বলতে পারবে না। তবে হ্যাঁ সাত যোজন দুরে মামুদহাটিতে হাবুল সরদার আছে। সেই বেশীর ভাগ কুমীরের চামড়া নিয়ে আসে। সেইই একমাত্র কুমীর ধরার হদিশ দিতে পারে"। সাত যোজন তো কম দূর নয়। কিন্তু উপায় কি। অগত্যা এক দিন ভোরবেলা কাদম্বিনী রওয়ানা দিল হাবুল সরদারকে ধরতে।

মামুদহাটিতে হাবুলের অত্যাচারে কুমীরদের প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। কুমীর বোকা হতে পারে কিন্তু নির্বোধ নয়। দিনের পর দিন কুমীরদের মৃত্যু ও মৃতদেহ জলে ভেসে উঠা তাদের কাছে প্রাণের শঙ্কা হিসাবে দেখা দিল। বাস্তু তন্ত্রের এক পীড়া স্বরূপ। প্রাণের টানে তারা মামুদহাটি থেকে দূর দূরান্তে সরে পড়ল। কুমীরের অভাবে হাবুলের পেশায় টান ধরল। যা দু একটা কুমীর আছে হাবুলের পাতা ফান্দে তারাও আর ধরা দেয় না। কিন্তু কি করবে হাবুল কুমীরের জন্য তো আর ছেলে পুলে ছেড়ে গ্রামের বাইরে যাওয়া যায় না। পেশায় টান ধরলে তার কিছু করার নেই। এমত পরিস্থিতিতে কাদম্বিনীর আগমন। মামুদহাটিতে হাবুলের সাথে তার দেখা মিলল বটে।

প্রথম পরিচয়ে জানা গেল কাদম্বিনী ঠাকুরান নিতান্ত সামান্য ঘরের মহিলা মাত্র। দূরের নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম থেকে এসেছে । রহমান ভাইয়ের থেকে তার ঠিকানার খোঁজ

মিলেছে। কুমীর শিকারের ফন্দি ফিকির জানা তার একমাত্র অভিপ্রায়। কাদম্বিনীর কথায় স্বস্তির নিঃশ্বাস খেলে গেল হাবুলের মনে। যাক বাবা, নাদু শেখের চর নয় মহিলা। বেশ কিছুদিন ধরে ও গ্রামের নাদু শেখ তার কাছে আবদার করে চলেছে কুমীর শিকারের ফন্দি জানার জন্যে। নানা অজুহাতে বিস্তর অছিলায় নাদু শেখকে বিরত রেখেছে । বাধ্যও হয়ে শেষ মেষ বলেছে "দেখ বাপু নাদু, কুমীর শিকার আমার ব্যবসা। কুমীর শিকারের ফন্দি তোমাকে জানান সম্ভব না"। সেই থেকে নাদু ফন্দি ও কৌশল জানার লোভে একের পর এক চর পাঠিয়ে চলেছে। কিন্তু কিছুতেই জানতে পারিনি।

হাবুল সরদার, হতো দরিদ্র শ্রেণীর। কুমীরের চামড়া বিক্রি করা তাঁর এক মাত্র উপার্জনের রাস্তা। সমাজের কুটিলতা নীচতা তাকে সম্মোহন করে উপার্জনের লোভে। দু পয়সা উপার্জনের লোভে নোংরামোকে আশ্রয় করতে সে পিছুপা হয় না । বাধে না। কাদম্বিনীকে পেয়ে দুষ্টু বুদ্ধি তাঁর মাথায় খেলে গেল। সে কাদম্বিনীকে জিজ্ঞাসিল কুমীর মেরে সে কি করবে। কাদম্বিনী বলল কুমীরের অত্যাচারে তাঁর গ্রাম আজ অতিষ্ঠ। ভয়ে মানুষ গ্রাম ছাড়া। তার বাম হাতটাও কুমীর নিয়ে গেছে। সে শুধু কুমীর মারতে চায়। কথাটা শুনেই হাবুলের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেলল সে জানাল সে তাকে কুমীর মারার কৌশল জানাতে পারে প্রকান্তরে সে শুধু মৃত কুমীরের দেহ তাঁর থেকে আশা করে। কাদম্বিনী এক মুহূর্ত ভাবল কুমীর মারা তার আসল উদ্দেশ কুমীরের চামড়া বেচা তাঁর আকাঙ্ক্ষিত নয়। সে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। হাবুল জানাল। কুমীর মারার দুটি সহজ উপায়। প্রথমত কুমীরের সঙ্গে জলে লড়াই করা মোটেই সম্ভব নয়। প্রথম কুমীরকে প্রলব্ধ করে ডাঙ্গায় নিয়ে আসতে হবে। সেজন্যে দরকার এক ছাগল ছানা যাদের গায়ে লোম কম। এখানে মিষ্টি আবহাওয়ায় দু ধরণের জোঁকের বড় প্রভাব। গ্রামে গঞ্জে তাদের বড় আধিক্য। স্থলে ছিনে জোঁক ও জলে পেটো জোঁক । পেটো জোঁক আকারে বড় হয়। জোঁকের কথা শুনেই কাদম্বিনীর গা টা ঘিন ঘিন করে উঠল। হাবুল বলল জোঁকের জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না আমি নিয়ে আসব। জোঁকের আসল প্রতিষেধক হোল হুঁকোর জল আর লবণ। জোঁকের মুখে লবন বা হুঁকোর জল দিলেই হল। জোঁক নিস্তেজ হয়ে পড়ে।। হাঁটা চলার শক্তি রোহিত হয়। তখনই আসে তাদের উপর আধিপত্য করার উপযুক্ত সময়। ধরবার মোক্ষম মুহূর্ত। কথা গুলো হাবুল অনর্গল বলে চলে। আর কাদম্বিনী মন্ত্র মুগ্ধের মতো গোগ্রাসে সেগুলো গিলতে থাকে। হাবুল জানায় বাগানের ধারে ননীবাবুর পচা ডোবায় প্রচুর পেটো জোঁক মেলে। বলল "আমি ধরে নিয়ে যাব আপনার জন্যে। আপনি ছাগল ছানা রেডি করেই আমাকে খবর দিন"।

এরপর ছাগল ছানার গায়ে জোঁক লাগিয়ে নদীর ধারে একটি লম্বা দড়িতে বেঁধে রাখতে হবে। জোঁকের রক্ত শোষণের ফলে ছাগল ছানা আকুতি বিকুতি করে লাফাতে থাকবে আর নদীর জলে ঝাঁপাবে। জলে ছাগল ছানার দাপাদাপি দূর থেকে কুমীরদের প্রলুব্ধ করবে খাদ্যের সন্ধানে। ছাগল খাবার লোভে কুমীর ছাগলের পিছু নিতে বদ্ধপরিকর। কুমীরের দেখা পাওয়ার পড়েই এক হ্যাঁচকা টানে দড়ি ধরে ছাগলটাকে ডাঙ্গায় তুলে আনতে হবে গোপনে। যেন কুমীর মানুষগুলোকে দেখতে না পায়। ছাগল কুমীর লুকোচুরি খেলা শুরু হবে এরপরে। এক প্রকৃতির নিয়মে "হয় খাও না হয় খাদ্য হও"। ছাগল যত দূরে যাবে কুমীর তাকে খাবারের লোভে অনুসরণ করবে। বেশ কিছু দূর কুমীর ডাঙ্গায় আসার পড়ে কুমীরকে তাড়া করলে কুমীর এবার ছাগলের আসা ছেড়ে দিয়ে নিজের স্বচ্ছন্দ এলাকা নদীর পথে ফিরবে। হাবুল বলল এখানেই মস্ত বড় খেল কুমিরের স্বভাব ও ধর্ম হল। যে পথ বেয়ে সে ডাঙ্গায় উঠবে ঠিক সেই পথেই প্রত্যাবর্তন করবে। শত প্রলোভনে শত ভয়ে সে আগের পথ থেকে একটুও বিচ্যুত হবে না । কুমীরের ডাঙ্গার উঠার পথে নরম কাদার উপর দিয়ে যাবার সময় এক প্রশস্থ চিহ্ন রেখে যাবে। এর পর কুমীর ডাঙ্গার মধ্যে বেশ কিছু দূর চলে এলে, তার চলার পথে ৫-৬ টা ধারালো ছুরি সোজা করে পুঁতে দিতে হবে। ছুরি গুলির ধারাল কিনারা মাটির উপরেই থাকবে। এবারে কুমীরকে ডাঙ্গায় তাড়া করতে হবে যাতে সেই একি পথ ধরে নদীতে নেমে আসে। আসার সময় ধারাল ছুরির সংঘাতে কুমীরের পেটের তলার নরম চামড়া ফালা ফালা হতে বাধ্যও। এর কোনরূপ ব্যতিক্রম নেই। বুঝি বিধির অকাট্য লিখন। ভবিতব্য। ধারাল ছুরির ক্ষতও থেকে পরিত্রাণ পাবার সুযোগ তার নেই। নদীতে নেমেও নিস্তার

নেই। আনুমানিক ৬-৭ ঘণ্টা বাদে পেট ফালা করা কুমিরের মড়া দেহ নদীতে ভেসে উঠবে। কপোতাক্ষ মিষ্টি নদী। তার জলে জোয়ার ভাটার টান নেই বললেই চলে। তাই মড়া কুমীরের দেহ জলের টানে দূরে যাবার সম্ভাবনা কম। এই হলো কুমীর মারার কৌশলের সংক্ষেপে ইতিবৃত। কথা গুলো কাদম্বিনী শুধু গোগ্রাসে গিলল না মরমে অনুধাবন করল।

ঠিক হল কাদম্বিনী সব সরঞ্জান জোগাড় করার পরে হাবুলকে খবর দেবে। যেই মতো কথা সেই মতো কাজ। গ্রামে এসে কাদম্বিনী সুধান্ন কামারের কামার শালা থেকে ৬ টা লম্বা হাতল যুক্ত ধারল ছুরি বানাতে দিল। ছাগল ছানারও জোগাড় হল। ফলে হাবুল ও কাদম্বিনীর যৌথ প্রয়াসে মাসাবধি ছোট মাঝারি শতাধিক কুমীর মারা গেল। মৃতদেহ পেয়ে হাবুলের আনন্দ আর ধরে না। হাবুল কিন্তু মৃত দেহ গুলো লুৎফরের আড়তে আনতে ভুলচুক করল না। হাবুলের সংসারে অর্থের আতিশয্য দেখা দিল। আর্থিক স্বচ্ছলতা এক স্বস্তির অলিখিত প্রলেপ।

কিন্ত সময় সবার সমান যায় না। ধীরে ধীরে নিশ্চিন্দিপুরের নদীতে কুমীরের আকাল দেখা দিল। তথাপি মস্ত বড় কুমীরটা এখন তাদের অধরা। নদীতে সে দু একবার ভেসে ওঠে বটে কিন্তু ছাগল ধরার কোনরূপ অভিপ্রায় ও আগ্রহ দেখায় না। অধরাই রহিল সে। ব্যাপারটা হাবুল ও কাদম্বিনীর মনে খচ খচ করে বিঁধতে লাগে। শত প্রচেষ্টা ও হাবুলের অভিজ্ঞতা কোন কাজে এলো না। শেষ মেষ নিজের অভিজ্ঞতার উপর ভর করে তাদের কৌশলে দুটো পরিবর্তন আনল। হতে পারে কুমীর জীব, কিন্তু বুদ্ধিতে কম যায় না। তার অপর মস্ত কুমীর বলে কথা। তার বুদ্ধিও অনেক। প্রথমত কুমীর শিকার থেকে তারা বেশ কিছু দিন বিরত থাকল যাতে কুমীরের মনে উপলব্ধি হয় নদীতে কুমীর শিকারিরা অনুপস্থিত, শেষ পরিবর্তন আনল ছাগলের পরিবর্তে এক মাঝ বয়সী বাছুর। আকারে ও ওজনে খাদ্য হিসাবে সে বেশে ওজনদার। বৃহৎ কুমীরের খাদ্যের পক্ষে সামাঞ্জস পূর্ণ ও পরিপূরক। অবশেষে এইই পরিবর্তন কাজে এলো। জলে বাছুরের দাপা দাপিতে যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও খাবারের লোভে সে বাছুরটাকে ধরতে এলো। পরিকল্পনা মাফিক বাছুরটা কুমীরের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেতে খেলতে ডাঙ্গায় উঠিল। কুমীর হেলতে দুলতে বাছুরকে অনুসরণ করল খাবারের লোভে। ভাবখানা এমন বাছুর তুমি যাবে কোথায় তোমায় আমি ধরবই। একটু থেমে থেমে সে চোখের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখছে বাছুরটা তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে। মানুষ রূপী তাঁর শত্রু তাকে ধরার জন্যে মুখিয়ে আছে কিনা। সে সদা সতর্ক মানুষ রূপী জীবের আচমকা আক্রমণ থেকে। কি তার চেহারা। দেখলে ঈর্ষা হয়। যেমন হৃষ্ট পুরুষ্ট খোলতাই চেহারা। লম্বায় প্রায় ল্যাজ সহ ১২-১৪ ফুট হবে। শিকার ধরার লোভে ক্রোমাগত ল্যাজটা এদিক ওদিক নেড়েই চলেছে। চোখে কুটিল দৃষ্টি, পিট পিট করে তাকাছে। মুখের ভিতর সারি সারি সাদা হিস্র দাঁতের সারি। খাবারকে মুহূর্তে চূর্ণ বিচূর্ণ করার অপেক্ষায়। পিঠের উপর সেঁওলার সবুজ রঙের পুরু প্রলেপ। তার উপর দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা কচুরিপানা। বুকের ও তলপেটের দিকে হাল্কা হলুদ রঙ। সবই প্রথা মাফিক চলছিল কিন্তু ঘটল এক নিদারুণ বিপদ। কুমীরের তাড়নায় বাছুরটা পালাতে পারলে বাঁচে। প্রাণ ভয়ে ঝোপের এদিকে থেকে ওদিকে লাফ দিতেই ঝোপের আড়ালে থাকা কাদম্বিনী বাছুরের দড়িতে জড়িয়ে তাল সামলাতে না পেরে মাটিতে ছিটকে পরল। কুমীরটা নিকটে শোয়া কাদম্বিনীর দিকে এগোল বাছুরকে ছেড়ে। ব্যাপারটা উপলব্ধি করে সঙ্গী সাথীরা লাঠি সোটা নিয়ে কুমীরের হাত থেকে কাদম্বিনীকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মানুষের চিৎকারে হই হট্টগোলে ভয় পেয়ে কাদম্বিনীকে ছেড়ে কুমীরটা নদীর দিকে ফিরে এলো। নদীর জলে সে একান্ত নিরাপদ। নিজের ঘরণা। কুমীরের যাত্রা পথে হাবুল সরদার তড়িঘড়ি ছুরি বসাতে শুরু করেছে। সবে গোটা চারেক ছুরি ও বসিয়েছে। পঞ্চম ও শেষ ছুরিটা বসাতে যাবে। সামনেই তাঁর সৃষ্ট রাস্তা ধরে বয়ে আসছে এক কালাতক যম। হা করা এক বৃহৎ আকারের সেই কুমীর হাবুলকে গিলবার নিমিত্ত। চিতার মতো তড়িৎ গতি নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাবুলের উপর। কুমীরের আক্রমণ এড়ানো হাবুলের পক্ষে একপ্রকার দুঃসাধ্য ও অসম্ভব। দৌড় দেবার আগেই হাবুলের ডান হাতটা কুমীরের মুখের মধ্যে। তড়িৎ গতিতে টানতে টানতে হাবুলকে সঙ্গে নিয়ে সে নির্দ্বিধায় নদীর পথে পা বাড়াল। পিছনে হাবুলের সঙ্গী সাথীরা তারস্বরে চিৎকার করছে

লাঠী দিয়ে কুমীরের পিঠে দমা দম আঘাত করেও হাবুলকে বাঁচাতে পারল না। কি অমানুষিক বল তার। এতোবড়ো শরীর নিয়ে, লাঠীর আঘাত উপেক্ষা করে, ক্ষিপ্র গতিতে সে হাবুলকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিল। বাঁচার আশায় নদীতে ডুব দেবার আগে হাবুল চিৎকার করে চলে, বাঁচাও আমাকে বাঁচাও আমাকে নিয়ে গেল"। কি করুন সে আর্তনাদ মৃত্যুর আগে মানুষের শেষ আর্তনাদ। হাবুল সঙ্গী সাথীদের প্রতি কাকুতি মিনতি করে বলতে থাকল "যে করে পারো আমায় ছাড়াও। আমাকে বাঁচাও। কিন্তু কে শোনে কার কথা। শত চেষ্টা করেও তারা হাবুলকে ফেরাতে পারল না। তাঁর কাতর মিনতিটুকুই বিফলে গেল। সঙ্গী সাথীদের কানে বেজে চলল হাবুলের সেই আকুতি মিনতি গুলো। এক বিফলতার নিদারুণ প্রতিছবি। সকলের এক রাশ হতাশাগ্রস্ত মুখ। হাবুলের অনুপস্থিতিতে কাদম্বিনীর বাক রোহিত হয়ে গেল। মুখ দিয়ে কোনো বাক্যও সরল না। সে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ল। বিড় বিড় করে অনবরত বকতে থাকল "তার ভুলের দোষে হাবুলের জীবনে মাশুল গুনতে হল। কার নিমিত্তে। এতো দিনের সঙ্গীর অভাব তাঁর কাছে বিশ্বাস ভঙ্গের নিমিত্ত মাত্র। সে মনে মনে ভাবতে লাগল, সে কি বিশ্বাসঘাতক। না স্রেফ দুর্ঘটনা। হাবুলের অকাল মৃত্যুর জন্যে সে কি দায়ী ? কিন্তু বিশ্বাস ভঙ্গ করেনি প্রাণহীন মাটিতে পোতা ধারাল ৪ টি ছুরি। তারা কুমীরকে নির্দ্বিধায় পথ ছেড়ে দেয়নি। পথ আগলে তারা হাবুলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছে তিলে তিলে। ছুরিগুলির উপর দিয়ে যাবার সময় কুমীরের বুক তল পেট তাদের ধারাল ফলায় ফালা ফালা করে দিয়েছে। তারই ফল হিসাবে কুমীরের বাম দিকের পেট আজ ক্ষত বিক্ষত। হ্যাঁ কালচে নীল রঙের নাড়ী ভুঁড়িগুলি রক্তের সঙ্গে বাহিরে বেরিয়ে এসেছে। তার চলার পথখানি রক্তে লাল। ছুরি গুলির ধারালো ডগায় কুমীরের নরম চামড়া, মাংস ও রক্তের ছড়াছড়ি। নিষ্ঠুর নির্মম প্রতিশোধ।

কথিত আছে খাবারের আগে কুমীর তার খাদ্যকে সূর্যের উদ্দেশে উৎসর্গ করে। হাবুলের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যতিক্রম হবার নয়। কুমীরটা মাঝ দরিয়ায় সূর্যকে দেখাবার তরে একবার ভেসে ওঠে। বলার অবকাশ নেই, মৃতপ্রায় হাবুল তখন বাম হাতখানি তুলে নাড়তে থাকে যেন সঙ্গী সাথীদের জানান দেওয়া। এ যাত্রায় আর রক্ষে নেই। চিরবিদায় বন্ধু। কুমীরটা কি আদৌ হাবুলকে খেতে পেরে ছিল ? জানার বা বোঝার উপায় ছিল না। এক দিন পরে দুটি মরদেহ কপোতাক্ষের জলে এক সঙ্গে ভেসে ওঠে। একটি হাবুলের অন্যটি সেই কুমীরের। হাবুলের অক্ষত দেহ জানান দেয় কুমীর তাকে মৃত্যুর পরেও খেতে পারিনি। হাবুলের মৃত্যুর ছবি আজও কাদম্বিনীর বুকে স্পষ্ট আঁকা আছে। কিছুতেই সে হাবুলের বিরহের কথা ভুলতে পারে না। কথা মনে পরলে হাপুস নয়নে কাঁদে আর ভাবে হাবুলের জীবন নিয়ে প্রকৃতি কি কুমীরদের মৃত্যুর বদলা নিলো ? সেই যাতনা কাদম্বিনীকে এতোটাই ব্যথিত করে ছিলো যে তারপরে কাদম্বিনীকে আর কখনও কেউ কুমীর শিকার করতে দেখেনি।

কাদম্বিনীর ও হাবুলের ফাঁদে বন্দি হয়ে কুমীররা বার বার মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। মানুষের বুদ্ধি ও চালের সঙ্গে তারা পেরে উঠবে কেন ? নিতান্ত বাধ্য হয়ে কুমীররা প্রায় সকলে নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম ছাড়া হল। যে কাপোতাক্ষর জলে কুমীরের বিচরণ ছিল অবিরাম, অনাবিল। কাদম্বিনীর অত্যাচারে সে নদীর জল এখন শান্ত। না আছে কুমীরের আধিক্য না আছে দাপা দাপি। কালেভদ্রে মাঝ দরিয়ায় দু একটার দেখা মেলে কিন্তু কোন কারণেই তারা মানুষের গাঁ ঘেষে না। আদপে নিশ্চিন্দিপুর আজ কুমীরের ভয় থেকে নিশ্চিন্ত। তা সম্ভব হয়েছে কাদম্বিনীর কারণে। গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটতে বেশি দিনের প্রয়োজন হল না গ্রামের সকলে কাদম্বিনীকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। গ্রামে কাদম্বিনীর নতুন নাম "কুমির খেদানো কাদম্বিনী"। কপোতাক্ষর স্বচ্ছ জলে জোয়ার ভাঁটার টান বড় কম। জলে কুমীররা আর মাছেদের বিরক্ত করে না। ঘড়িয়াল, কুমীরের অভাবে মাছেরা স্বছন্দে অবিরত সাঁতার কাটতে থাকে। গ্রামের সকলে নির্ভয়ে নদীতে নামে স্নান সারে। দিকে দিকে কাদম্বিনী কৃতির কথা প্রচার হয়ে যায়। নিশ্চিন্দিপুর আদপে কুমীর শূন্য তাই গর্ব অনুভব করে। যত না জোটে কাদম্বিনীর কপালে তার চতুর গুন আশ্রয় নেয় শশধর বনিকের বুকে গ্রামের মোড়ল হিসাবে। ধীরে ধীরে স্বপ্নের কথা শশধর বনিকেরও কানে পৌঁছায়। সেই থেকে খুব ধুম ধাম সহযোগে শ্মশানকালীর পূজা গ্রামের এক প্রথা হয়ে

দাঁড়িয়েছে। স্বপ্নে গ্রামের সরল মানুষ গুলোকে করে তুলেছে আরও শ্মশানকালী মুখাপেক্ষী। অলৌকিক শক্তির একমাত্র আধার।

দিন যায় রাত আসে, মাস, বছরও কাটে, কালের ধারা আজও সতত বহমান। প্রতি বছর মাঘী অমাবস্যায় শ্মশানকালীর পূজা গ্রামে প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কোন বিরাম নেই। যেন কালের দৃঢ় বন্ধন সে বন্দি নিশ্চিন্দিপুরের নাগ পাশে। ইতিমধ্যে শশধর বনিক গত হয়েছে, তার পুত্র গদাধর বনিক এখন গ্রামের মোড়ল। কালের নিয়মে কাদম্বিনীও পরলোক গমন করেছে অনেক দিন হল। সে যে গ্রামের কতো বড় হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল তা সাম্প্রতিক কালে স্বরণার্থে তার ১২ ফুট দীর্ঘ আবক্ষ মূর্তি শ্মশান কালীর মন্দিরের পাশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গদাধর বনিকের একান্ত প্রচেষ্টায় ও আন্তরিকতায়। কপোতাক্ষ দিয়ে বহু জল গড়িয়ে গেছে। নোয়াখালির দাঙ্গা। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ। পূর্ব পাকিস্থানের উৎপত্তি। এক ধর্ম অবলম্বীদের সাত পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে প্রাণের ভয়ে গৃহ ত্যাগ করে ভারতে পলায়ন। পরে বাংলাদেশের সৃষ্টি। মুজিবর রহমানের মুক্তিযুদ্ধ, আন্দোলন, বীরত্বের কাহিনী। ভারত পাকিস্থান যুদ্ধ। পাকিস্তান সেনার আত্মসমর্পণ কতো কি তার কি ইয়ত্তা আছে ? কিন্তু কাদম্বিনীর স্মৃতি যেন এস ওয়াজেদ আলীর "সেই ত্রাদিতিওন এখনও বহমানের সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণ। জীবন্ত। কষ্টি পাথর দিয়ে লেখা দিনে দিনে যার উজ্জ্বলতা বাড়ে ক্ষয় হয় না। কপোতাক্ষর জল আজো আগের মতো শীতল, স্বচ্ছ, অগহিন তার ধারায় কিছুতেই পরিবর্তন নেই। কালের পরিবর্তনের ধারা তাকে স্পর্শ করে না। তেমনি স্পর্শ করে না শ্মশান কালীর মন্দিরকে, কাদম্বিনী ঠাকুরানের আবক্ষ মূর্তিকে। ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সম্প্রদায় ৪৬ শতাংশ থেকে নেমে ৮ শতাংশে পরিণত হয়েছে তথাপি প্রতি বছর ঘটা করে হিন্দুদের আয়োজনে এক্ষণও সসম্মানে কাদম্বিনীর সৃষ্ট কালী পুজো হয়, সেই ধারা সতত বহমান, অবিচল। জানিনা আর কতো দিন এই অনুষ্ঠান চলবে হয়ত আদি অনন্তকাল ধরে। লোকের মুখে ফিরবে কাদম্বিনীর কুমীর শূন্য করার কাহিনী। চাই এই কাহিনী লোক মুখে প্রচারিত হবে অনন্তকাল ধরে, যার কোন ক্ষয় নেই, সীমা নেই, পরিব্যাপ্তি নেই। তারই মাঝে মিষ্টি হাঁসি মুখে কাদম্বিনীর মূর্তি থাক অবিচল ভাবে দাঁড়িয়ে, নিশ্চিন্দিপুরের শিকারিনী কুমীরের কালান্তক প্রতিমূর্তি, যম।

সুললিতা চাকী

শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন

"শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন..."। তা লেগেছে এবং খুব ভালো করেই লেগে আছে সেই সেদিন থেকে যেদিন এই উত্তর আমেরিকাতে পা দিয়েছিলাম। পড়াশোনা করার জন্য যেদিন পূর্ব থেকে পশ্চিম গোলার্ধে এসেছিলাম, সেদিন বুঝিনি সব ভালোর জন্যেই কিছুনা কিছু মাশুল গুন্‌তে হয়। আমার জন্য সেই মাশুল হলো এই ভয়ঙ্কর শীতকালটি ! আরে বাবা সবার কি সব সয় !! আমি হলাম সেই বাংলা দেশের মেয়ে যেখানে কিনা ছয় ঋতুর ব্যাপ্তিতে গ্রীষ্মকালই দাদাগিরি করে থাকে; ঠিক তারপরেই রেলাটা নেয় বর্ষা, শরৎ-ও দুর্গাপুজোর ধাক্কায় ভালোই বাজার দখল করে আর বসন্ত-ও ঠিকঠাক নিজের রোলটুকু প্লে করে, দোলের রঙে সকলকে রাঙিয়ে স্টেজ থেকে বিদায় নেয়। কিন্তু সবচেয়ে ভিরু পায়ে আসব কি আসবনা করে গলা খাঁকরানি দিতে দিতে আসে শীতকাল। ছোটবেলায় দুর্গাপুজোর হুল্লোড় শেষে হপ্তাখানেক বাদে খুব দায়িত্ব নিয়ে ছাদের রোদে বাজি শুকোতে দিতাম; সেই কালীপুজোগুলোয় অনেক রাতেও যখন মা তাঁর বেয়াড়া মেয়েকে কিছুতেই পাশের বাড়ির পুজো থেকে সরিয়ে আনতে পারতেন না, তখন অগত্যা একটা হাল্কা চাদর এনে গায়ে জড়িয়ে বলতেন "দয়া করে জড়িয়ে রেখো, বাইরে হিম পড়ছে" – তখন হঠাৎ মনে হতো এবারে তাহলে গুটিগুটি শীত আসছে ! আমার ছেলেবেলার শরৎ আর শীতের মাঝে হাইফেন-এর মতো এখনো লেগে আছে মায়ের ওই "হিম পড়ছে" টুকু। গরমকালটা যদি আম আর ঘাম, জাস্ট এই দুটো দিয়ে ডিফাইন করি তাহলে শীতকালের বোধহয় নলেন গুড়, কমলালেবু আর খুব জবরদস্ত করে মাথাময় জড়ানো মাফলার অথবা "মাঙ্কি ক্যাপ্"।

দিব্বি মনে আছে যে সোয়েটার, মোজা, মাঙ্কি ক্যাপ্ পরিহিত আমি হাঁ করে শীতের কোনো এক রবিবারের সকালে বাড়ির খেজুর গাছের রস কাটা দেখছি আর ভাবছি কবে এইভাবে গাছে উঠে আমিও এরকম রস কাটতে পারব (উচ্চাকাঙ্ক্ষা গুলো তখন সেরকমই থাকত!)। সেইসব হতো আমার দাপুটে সব শীতের সকাল এবং বলাইবাহুল্য খুবই ব্যক্তিনির্ভর মানে subjective ছিল সেই ঠান্ডা-লাগাটা। এর চেয়েও প্রবল যে কিছু হতে পারে, তখন তার কল্পনা ওই কচি মাথায় আসেনি। আর সত্যি বলতে কি যিশুর জন্মদিনে পিকনিক, বাড়ির তৈরি কেক অথবা চিড়িয়াখানা বা বটানিকাল গার্ডেন দেখতে যাওয়া – সব মিলিয়ে শীতকালটাকে benefit of doubt দিয়েই দিতাম। বলতে নেই, পরের দিকে "ঠান্ডা" নিয়ে কিঞ্চিৎ ফ্যান্টাসিও তৈরি হয়েছিল। তখন, একটা বয়সে সব ছেলেরাই মাধুরী দীক্ষিতকে বউ বা নিদেন পক্ষে প্রেমিকা করার দুঃস্বপ্ন দেখত। আর ওঁকে, কিন্তু মেয়েগুলো অর্ধেক হিংসে করত আর বাকি দল পুজো করত। আমি পড়তাম ওই পরের দলে। একদিন টিভি-র পর্দা জুড়ে দেখলাম একটি গানের সঙ্গে নৃত্যরতা মাধুরীকে, সেটা এমন কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয় কেননা মাধুরী অভিনয় ও নাচের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু যেটা চোখ টেনেছিল সেটা হোল backdrop-টা – সেটা ছিল ধূ ধূ বরফের প্রান্তর এবং পরে জেনেছিলাম যে ওটা আলাস্কা !

মাধুরীর উপর ভক্তি সপ্তমে চড়ে গিয়েছিল এই দেখে যে উনি দিব্বি একটা ফিনফিনে নীল শিফনের শাড়ি পরে, ওই এক রাশ বরফের মধ্যে (বেশ হাওয়া যে দিচ্ছিল সেটা বোঝাই যাচ্ছিল) ম্যানেজ করলেন ! সত্যি বলতে কি, সেদিন টিভি-র এপারে ফ্যানের তলায় বসে ওই আলাস্কার ঠান্ডার কোন আন্দাজ-ই হয়নি। তাই ওই চুড়ান্ত romantic sequence-এ মাধুরীর কেবলমাত্র শাড়ি পরিহিতা রূপটি-ই সবচেয়ে মানানসই লেগেছিল আর খুব বেমানান লেগেছিল আপাদমস্তক গরম জামায় ঢাকা সঙ্গের হিরো অনিল কাপুরকে। কিন্তু সেই sequence কালের চক্রে পরবর্তীকালে, এদেশে আমার জীবনেও যখন এল – তখন সেখানে প্রেক্ষাপটে শুধুই আমি, আপাদমস্তক জড়ানো আমি, আর কাঁড়ি কাঁড়ি বরফ ও

অসম্ভব ঠান্ডা হাওয়া কিন্তু মাইনাস্ হিরো, গান ও রোম্যান্স। সেদিন তখন আর বিন্দুমাত্রও সেই টিন-এজের ফ্যান্টাসি বাকি ছিল না ! বরং পিছনের দিকে তাকিয়ে মাধুরীকে ভক্তির পাশাপাশি বেশ বেচারাই লেগেছিল, মনে হয়েছিল যে উপযুক্ত পারিশ্রমিক এবং ভালো কাজ করার তাগিদে অভিনেতা অভিনেত্রীদের কত কষ্ট-ই না করতে হয় !

এদেশে ওহিয়ো-তে আমি প্রথম এসেছিলাম এক 'Fall'-এর সকালে। গাছেদের ঝলমলে রূপের ছটায় চারিদিকে তখন রঙের আগুন লেগে গেছে ! দেশে থাকতে, শুধুই সবুজ দেখা চোখের জন্য খুব অনন্য অনুভূতি ছিল সেটা। আর বিলকুল দেশের শীতকালের মতই শুধু একটা হাল্কা জ্যাকেটে বা মোটা সোয়েটারে আরামসে কাজ চলে যাচ্ছিল। তখনো বুঝিনি "তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে" এবং পুরোনো বাংলা ছবি কুহেলির অনুকরণে বলতে গেলে "আসছে, সে আসছে"!! রীতিমত দামামা বাজিয়ে এল ইস্ট কোস্টের শীতকাল। সেদিন প্রথমবারের জন্য বুঝলাম ঠান্ডা আসলে কাকে বলে আর খুব অনুশোচনা হয়েছিল এই ভেবে যে দেশের ঐ বিনীত, নিরীহ শীতকে আমি এখানে আসার আগে পর্যন্ত কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম।

এখানকার এই ডাকাতে-২০ সেলসিয়াস শীতের তুলনায় আমার শহরের শীত তো নেহাত-ই শিশু; সবে হাত পাকাচ্ছে, এরকম ছিঁচকে চোর ! ছোট থেকে বড় হওয়ারকালে দেশি বিদেশি সিনেমাতে কোন সিনে "বরফ পড়া" একদম পাত্তা দিতাম না, তার চেয়ে বেশি নজর থাকত নায়ক-নায়িকার হেব্বি হেব্বি ভালবাসার সংলাপে। এখন বাস্তবে বুঝি, ওইরকম স্নো-ফল্ মাথায় নিয়ে প্রেম কেন, ঝগড়া করাটাও খুব ইম্যাচিওর, ইম্প্র্যাক্টিকাল এবং ডিফিকাল্ট কাজ। ওহিয়ো-তে প্রথম শীতকালে, এক সকালে জানালার ব্লাইন্ড সরিয়ে দেখলাম চারিপাশ ঢেকে গেছে সারারাত ধরে পড়া বিশুদ্ধ বরফে। বরফ দেখতে ছোটবেলায় ছুটে গেছি সিমলা, কুলু, মানালি, রোহটাংপাস্-এ; কিন্তু বাড়ির পাশে, জানালার ধারে এত্ত বরফ এই প্রথম! সেই উচ্ছ্বাসে ক্লাসে যাওয়ার তাড়ার মধ্যেও নিজেকে সামলাতে পারিনি – ঘুম থেকে ডেকে তুলেছিলাম উইসকনসিন-এ প্রেমিক প্রবরটিকে। আমার গদগদ স্বরে বলা "উফ্ কি ফ্যান্টাস্টিক, উফ্ কি প্রিস্টাইন"-এর পরিবর্তে ওপাশ থেকে ভেসে এসেছিল একটা অনুজ্ঞা মাত্র – "হুম্"।

জীবনে প্রথম গায়ে গায়ে বরফ চাক্ষুস করে, আমার আদেখলামোর উত্তরে সমানতর আদেখলামো আশা করিনি যদিও, তবুও এত্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর-ও হিসেবের বাইরে ছিল – বলাইবাহুল্য খুব মনখারাপ হয়েছিল এহেন "ইনসেন্টিটিভ" আচরণে। কিন্তু দুদিন বাদে যখন আমি (বরাবর-ই উটমুখো, আকাশের দিকে তাকিয়ে চলা টাইপ) ব্ল্যাক আইসে আছাড় খেয়ে পড়লাম, তখন কোমরে হাত ডলতে ডলতে ওই "হুম্" টার অনুক্ত বাকিটুকু দিব্বি পরিস্কার শুনতে পেলাম – "হুম্, এখন খুব ভালো কিন্তু পরে বুঝবে !!!"। আমার মনে হয়, প্রত্যেক বছর এন্ট্রি নেওয়ার আগে, শীত একটা কোটা বানিয়ে আনে যে এবছরে এই এই স্টেটে এত এত জনকে আছাড় খাওয়াব। আর সেই লিস্টের মান রাখতে খুব নিষ্ঠাভরে আমি এখনো পর্যন্ত, এই পনেরো বছর বাদেও নানারকমভাবে আছাড় খেয়ে চলেছি। এমনিতেই এই শীতকালে ধুমসো কোট আর স্নো-বুটের জন্য নিজের চলাফেরার ব্যালেন্সের একেবারে বারোটা বেজে যায়। ওজন চিরদিন-ই জানি যে হাতেই তুলতে হয়। পাকেচক্রে যে পায়েও ওজন বাঁধতে হবে তা ভাবিনি ! বুঝতে পারলেননা তো কি বলছি ? ঐ স্নো-বুট পরে একতাল বরফ ডিঙ্গিয়ে হাঁটা আর পায়ে ওজন বেঁধে চলা একি ব্যাপার, অতএব খুব সহজেই অনুমেয় যে এরকম ইমব্যালান্সড দশায় পতন অবশ্যমম্ভাবী। কিন্তু মাস্টারপিস্টা ঘটেছিল ইলিনয়-এ বছর ৮-এক আগে।

কর্মস্থল থেকে ফিরছি এবং সবে বাস থেকে নেমে চতুর্দিকে হাঁটু সমান বরফে খুব সাবধানেই প্রথম পা ফেলেছি। কিন্তু অন্য দিনের মত এগিয়ে না গিয়ে বরং দেখলাম খুব সহজভাবেই ঐ বরফের গাদার মধ্যে ধপাস্ করে পড়ে গেলাম ! এক বাস লোকের সামনে খুব এমবারাসড্ হয়ে জলদি জলদি উঠতে গেলাম তো বটে কিন্তু নিশ্চই ক্যালকুলেশানে কিছু গন্ডগোল হয়ে থাকবে যে দেখলাম আবারো দিব্বি অনায়াসে পড়লাম। তারপর বিশ্বাস করুন, মনে হচ্ছিল এইভাবে অনন্তকাল ধরে আমি উঠছি আর পড়ছি – এবং এই ওঠা-পড়ার একটা পারফেক্ট

হিউম্যান সাইন-কার্ভ (sine curve) রচনা করাটাই ওই মুহূর্তে আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর আমার এই অধঃপতনের ঘটনাটা ঘটছিল ঠিক বাসের এগোনর মুখে – অতএব আমাকে চাপা দেওয়ার অভিপ্রায় না থাকায়, বাধ্য হয়েই বাসটিকে দাঁড়িয়েই থাকতে হয়েছিল যতক্ষণ না আমি এক বন্ধুর কল্যানে উদ্ধার পেয়েছিলাম। সেই কয়েক (অনন্ত) মুহূর্ত বাসশুশুদ্ধু লোক এবং চালক যথেষ্ট সময় পেয়েছিল সেদিনের বাড়ি ফিরে বলার গল্পের জন্য। এবং তারা যদি প্রত্যেকে বত্রিশ পাটি বিকশিত করে থাকে তাহলে তাদের কিছুতেই দোষ দেওয়া যায়না; এরকম নয়ন মনোহর ঘটনা তো রোজ রোজ ঘটেনা!! সকলের জীবনেই নানা গুটিকয়েক অপ্রস্তুত ঘটনা ঘটে থাকে এবং আমরা খুব চটপট সেগুলো ভুলে যেতেই চাই। কিন্তু প্রত্যেক বছর এই কালান্তক শীতকালে কাউকে পা পিছলে আলুর দম হতে দেখলেই নিজের স্মৃতি ভেসে ওঠে এবং বলাইবাহুল্য যে সেরা "বোরলীনের"-ও সাধ্য নেই আমাকে সেই "জীবনের নানা ওঠা-পড়া" ভুলিয়ে দিতে পারে।

এরপরেও এই শীতকালের উপরে রাগ হবেনা ?! তবে এত বঞ্চনার মধ্যেও কিছু লাভ হয়েছে বইকি। ছেলেবেলায়, আয়নার সামনে মায়ের সিঁদুর ডলে ডলে খুব চেষ্টা করতাম নিজের গালগুলোকে লাল করার – ঠিক যেমনটি দেখতাম রঙিন ছবির নায়িকাদের। কিন্তু তাতে কিছুক্ষণ বাদে গালের সঙ্গে সঙ্গে কান ও/বা পিঠ-ও লাল হয়ে উঠত সদ্যমোছা ঘরে সিঁদুর ছড়ানোর অপরাধে। পরে ঘোর গরমে, ফিল্ড-ওয়ার্কে বেরিয়ে অতি প্রিয় বান্ধবীর গালে সত্যি লালচে আভা দেখেছি এবং আমরা কজন এতই অবাক হয়েছিলাম যে নিতান্ত (অ)বালিকাসুলভ চপলতায় সমস্বরে তাকে তার এই বিশেষত্ব তখুনি অবহিত না করে পারিনি। স্বীকার করি সেদিন মনের গুপ্ত কোনে ইচ্ছে জেগেছিলো ইশ্ আমারও যদি হোত। আজ এই পোড়া শীতকালে বাড়ি ফিরি যখন, পেয়াজের খোসা ছাড়ানোর মত একের পর এক কোট, সোয়েটার, টুপি, গ্লাভস্ খোলা শেষে খেয়াল করি আমার এই শ্যামত্বকেও নাকের ডগা দিব্বি টুকটুকে লাল – এত বছর বাদে সুপ্ত চ্ছাপূরনের পুরো কৃতিত্বই এখানকার সূঁচ ফোটানো ঠান্ডা হাওয়ার কিন্তু তাতে আজকে আনন্দিত হওয়ার বদলে নিজেকে নাকের ডগায় লাল বল লাগানো ক্লাউন মনে হয়, হায় অকৃতজ্ঞ "আমি" (এ পৃথিবীতে মানুষকে খুশি করা যে কত কঠিন সেটা শীত-ও টের পায়)!!

তবে এখানে একবেলার জন্য হলেও বরফ এবং অতিরিক্ত শীতলতা আমি ক্ষমা করে দি সরস্বতী পুজোর দিনে। এই প্রবল আবহাওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক বছর সরস্বতী পুজোর আনন্দে আমার ছেলেবেলা-বড়বেলার সব সুখস্মৃতি মিশে এক হয়ে যায়। তখন রাতের পর রাত জেগে স্কুলে এবং বাড়িতে ঠাকুর সাজাতাম আর পুজোর দিনে খুব ভক্তি নিয়ে অঞ্জলি দিতাম কেননা দুদিন বাদেই থাকত ফাইনালগুলো। সরস্বতী পুজো আরো ভাল লাগত এই জন্য যে সেই পুরো দিনটাতে ইচ্ছে করে বা জোর করেও পড়তে (পড়াতে) বসা যাবেনা – সব বই যে মায়ের পায়ের তলায়, সরিয়ে নিলে পাপ হবেনা ! পড়াশোনা চালু হবে পরের দিন, আশীর্বাদী ফুল সব বই-এর খাঁজে খাঁজে রেখে। সেই নতুন হলুদ শাড়ি, আলপনা, পলাশ ফুল, খাগের কলম, কুল, জোড়া ঈলিশ থেকে আজকের এই সুদূর প্রবাসে পুজোর চালচিত্র বদলে গেছে অনেকটাই, কিন্তু এক রয়ে গেছেসেই মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথি, আর মায়ের কল্যানময়ী চাউনিখানি। তারও আগে এই উত্তর আমেরিকার উত্তর বা পূর্বের রাজ্য গুলোর দুর্গাপুজোর আবহাওয়া বলাই বাহুল্য আমাদের বঙ্গের শীতকাল – তাই দুর্গাপুজোর অনাবিল হুল্লোড়ের জন্য সেই হালকা শিরশিরে হালকা হালকা হিমেল হাওয়া কে আমি ক্ষমা দি একেবারে। কিন্তু আস্তে আস্তে তার পর থেকেই পরেই পুনর্মুষিক-ও ভব এবং নিরবিচ্ছিন্ন শীতের যাতনার পাঁচালি শুরু। এত বছরে এই প্রবাসে নতুন দেশ, নতুন রীতিনীতি, চালচলন সব আপন করে নিলেও এই দীর্ঘকালব্যাপী শীতকাল কেন জানিনা আমার "পর"-ই রয়ে গেল। কবিগুরুকে পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি – শীতের হাওয়ায় শান্তিনিকেতনে আমলকির ডালে ডালে বিলক্ষণ "নাচন" লাগে হয়ত, কিন্তু এই দেশে "শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন" আমার bone to bone মানে একদম "হাড়ে হাড়ে"।

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী

ডিনার সেটিং

শীতের শেষবেলার বিষণ্নতা মাখা একটা বিকেল। টুপটুপ করে সন্ধ্যা নেবে আসছে বন্ধ্যা গাছগুলোর শরীর বেয়ে। এই সময়ের গাছেদের বড় দীর্ণ লাগে সম্পূর্ণার। শরীরের খোলস পড়ো পড়ো। দুএকগাছি বরফ কোথাও লেগে বা আছে, কিন্তু ভার নেই আর। দেবার মত বাকিও কিছু নেই আর। ভারমুক্ত গাছগুলো ডানা মেলে আছে নতুন সবুজের জন্ম চেয়ে।

সম্পূর্ণা এই সময়ে একটা একটা করে জানালার পর্দা টেনে দিয়ে থাকেন। বহুদিনের অভ্যাস। ছোটবেলায় যখন দমদমে বড় হয়েছেন, সন্ধ্যাবেলায় এই কাজটা ছিল তার। ঠাকুমা মালা জপতে জপতে হাঁক পাড়তেন, শম্পি, তাড়াতাড়ি জানালাগুলো এঁটে দে তো, না হলে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা ঢুকবে ঘরে। রাতে আর শুতে হবে না, একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যাবে সবাইকে।

ব্লুমফিল্ডের এই বাড়িতে জানালায় জানালায় মশা আটকানোর মিহি তারজালি ভেলক্রো দিয়ে আঁটা। পোকা মাকড় ঢোকার ভয় নেই। কিন্তু তবু ভারী পর্দা টেনে সন্ধ্যার অন্ধকারকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে পটাপট আলোগুলো জ্বেলে দিতে ভাল লাগে। শব্দহীন আলোকজ্জ্বল হয়ে ওঠে এক একটা ঘর। শোওয়ার ঘরে বিছানাটা পরিপাটি করেন। কুঁচকনো বাসী বিছানা চোখে টাটায়। প্রতিদিন সকালেই বিছানার চাদর পাল্টাবার অভ্যাস তার। তবু সেই পাট পাট বিছানায় একবার হাত বুলিয়ে অভ্যাসমত গায়ের কম্বলটাকে পায়ের কাছে নিখুঁত সাজুজ্যে গোছানো। চোখে ঘুম খুব কম। বিছানার পাশ ঘেঁষে বইয়ের ছোট তাকটাই তার রাতের ভরসা। বইগুলো একটু উল্টেপাল্টে নাড়ানাড়ি করে নিলেন একবার। কার্পেটে একটুও ধুলোর দানা উঁকি দিচ্ছে না দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে গেস্টরুমটায় ঢুকলেন। এদেশে ধুলো নেই অত, তার ঘরে অতিথিই বাঁ আর কে আসে আজকাল ? একসময় এই ঘরে মাঝে মাঝেই লোক থাকত। সুনীলবাবু থেকেছেন বেশ কয়েকবার। কোন অনুষ্ঠানে শহরে বাঙালি অতিথি আসলে, তার বাড়িতেই থাকতেন তারা। এতগুলো ঘরের সদ্ব্যবহার হত। এখন আর ওসব কোথায়। তবু সপ্তাহে একবার চাদর, বালিশ বদলে ফেলেন সম্পূর্ণা। কেউ যদি কখনো আসে অসুবিধা হবে না।

লম্বা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গেলে পাশাপাশি আরও দুটো ঘর। দুটোরই দরজা ভেজানো থাকে। জিনিষপত্রে ঠাসা এই ঘরগুলোর একটায় থাকত রকি, অন্যটায় কিকি। এই ঘর দুটোয় কোনকিছুই বদলাতে মন চায়না তার। সন্ধ্যার মুখে পারতপক্ষে এই ঘরে ঢোকেন না তিনি। কখনো সখনো নেড়ে চেড়ে দেখতে আসেন, কিন্তু সেসব সকালের দিকে। তখন সারা সকাল সেখানেই কেটে যায়। রাতের না ঘুম সময়ের দিকে থাবা বাড়াতে পারে না সেই নেড়ে ঘেঁটে দেখার মুহূর্তগুলো।

ঠিক সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার মুখে রাজস্থানী চৌকির উপরে রাখা লম্বা ফুলদানিটার কাছে এসে একবার থমকে গেল পা। সাদা গোলাপগুলো একটু ঘিয়ে আভা নিয়েছে, কালকে নতুন ফুল আনিয়ে বদলাতে হবে।

কাঠের সিঁড়ির রেলিং ধরে কার্পেটে আস্তে আস্তে পা দিয়ে নেবে আসছিলেন সম্পূর্ণা। হাঁটুতে চাপ পড়ে। তাই সোজাসুজি না নেবে শরীরটাকে একটু কোনাকুনি করে পাশ কাটিয়ে নাবতে হয়। অনেকদিন ধরেই। তার মায়েরও এই পায়ের ব্যামো ছিল। শাড়ি পড়ে কিভাবে যে ম্যানেজ করত মা !

সুইচে হাত পড়তেই আলোয় ঝলমল করে উঠল রান্নাঘর, লিভিং রুম। পোরটিকোর আলোয় ঝিরঝির করে বরফ পড়তে দেখল সম্পূর্ণা। বেশি হবে না যদিও, ফোরকাস্টে তেমনটাই বলেছে। ছোটবেলায় বৃষ্টি দেখে মন নেচে উঠত, এখনো বরফ দেখলে খুব ভাল লাগে। রাস্তায় গাড়ি নিয়ে সেরকম আর বেরোতে হয় না, তাই বরফ পড়ার মজা নিতে পারে কোন দুশ্চিন্তার ভেজাল

ছাড়াই। সন্ধ্যা হতেই ডিনার করার অ্যামেরিকান অভ্যাসটা অমরেশের সঙ্গে পঞ্চাশ বছরে রপ্ত হয়ে গেছিল, এখনো সেই অভ্যাস বজায় রেখেছে। বিশাল বড় শোকেসের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিল কোন প্লেটটা নেবে। অসংখ্য ডিনার সেট সম্পূর্ণার। একসময় অনেক অতিথি সৎকার করেছে, ডিসপোজেবল প্লেট কোনদিন পছন্দ ছিল না। এই ব্যাপারে একটা শৌখিনতা বরাবরের, এখনো আমাজন থেকে অর্ডার দিয়ে নতুন ডিজাইনের প্লেট আনান সম্পূর্ণা। তবে আজকাল শুধু দুটোর সেট। বেছে বেছে একটা হলদে সবুজ ড্রাগন আঁকা চাইনিজ ডিজাইনের প্লেট হাতে তুলে নিল। পাতলা প্লেটে খাওয়ার তৃপ্তিই আলাদা।

টেবিলে ম্যাচিং করে সবুজ সুজনি বিছালো এবার। লিব্বির কালেকশানের থেকে গ্লাস নিয়ে জলে বরফ ভাসিয়ে প্লেটের পাশে সাজিয়ে রাখল সম্পূর্ণা। রুটি ভাত কিছুই আর খায়না রাতে। পেঁপেসিদ্ধ আর অ্যাসপারাগাস, সঙ্গে কটা লেটুস পাতা। চারটে গ্রেপ টম্যাটোও, লাল, হলুদ আর বাদামী। সুন্দর করে সব খাবার প্লেটে সাজিয়ে তৃপ্তির চোখে তাকাল সম্পূর্ণা – বেশ ভাল রং ধরেছে সব মিলিয়ে। জানালার দিকে মুখ ঘোরানো চেয়ারটায় বসে জানালার বাইরে অন্ধকারের মধ্যে সাদা হতে থাকা পৃথিবীটা দেখতে দেখতে খাবারে কালো মরিচ ছড়িয়ে দিতে থাকে সম্পূর্ণা।

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী

বিদ্যাসাগরের মাথা

বৃষ্টিটা বেড়েই যাচ্ছে। রাস্তা শুনশান। যেসব দোকানগুলো রাত দশটার আগে ঝাঁপ ফেলে না তারাও আজ শাটার নাবাচ্ছে এক এক করে। দূরে ঘণ্টা বাজল দশবার। দূর থেকে মিলের ভোঁ সময়টাকে নিশ্চিত করে দিল। ঘন মেঘের আড়ালে আকাশের সব আলো মরে গেলেও চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো বিদ্যাসাগরের ভেজা মূর্তি চারপাশ থেকে একটু আলো চুরি করে তার কৃষ্ণ অবয়বকে অন্ধকারেও জাগিয়ে রেখেছিল।

একটা মোটর সাইকেল চাকায় জল ছড়াতে ছড়াতে ঠিক মূর্তিটার নিচে এসে দাঁড়াল। আরোহীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত রেনকোটে ঢাকা। মোটর সাইকেলের পাশ দিয়ে একটা লম্বা মই উপর দিকে উঠে গেছে। লোকটা এক পা মাটিতে রেখে প্রথম মইটাকে মূর্তির গায়ে হেলান দেওয়াল। তারপর অন্য পাটাকে ঘুরিয়ে মোটর সাইকেল থেকে নাবতে বোঝা গেল ওর পিঠে একটা ছোট বোঁচকা মত। স্কুলের ছেলেদের পিঠে ব্যাগের থেকে বড়, কাঁধ থেকে ঝুলে কোমর অবধি নেবে এসেছে। লোকটা দুপাশে একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিল। কেউ কোথাও নেই সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে মইয়ের পাল্লা খুলে মাটিতে শক্ত করে দাঁড় করাল। যেভাবে মইটাকে ধরেছে বোঝা যায় এর উপরে ওঠার ভালই অভ্যাস আছে। ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রীদের মত। এরপর ব্যাগটাকে ঘুরিয়ে সামনে এনে হাত ঢুকিয়ে একটা হাতুড়ি বের করে আনল। আস্তে আস্তে ধাপ বেয়ে বেয়ে উঠতে থাকল মই বেয়ে। লোকটা বেশ লম্বা। পাঁচ ধাপ ওঠার পরেই বিদ্যাসাগরের ঘাড় ছাড়িয়ে গেল ওর মাথা। এবার লোকটা আবার পিছনের ব্যাগটাকে সামনে আনল। এখন ওর কোন হাত মইতে ধরা নেই। লোকটা দু পা ফাঁক করে হাঁটুদুটো একটু ভেঙ্গে নিজেকে ব্যালান্স করছিল। বোঝা যায় অভ্যাস আছে। ব্যাগ থেকে একটা ছেনি বের করল বাঁ হাত দিয়ে। ডান হাতে ছিল হাতুড়িটা।

বিদ্যাসাগরের গলা কাধের যেইখান থেকে উঠেছে ঠিক তার গোড়ায় নিয়ে ধরল ছেনিটা। অন্য হাতে হাতুড়িটা বাগিয়ে প্রথম ঘাটা মারল। বেশী জোরে মারেনি। কিন্তু নিস্তব্ধতায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া চরাচর ঢনঢন শব্দে জেগে উঠল। কিন্তু জাগার মত কেউ ছিল না। তবু প্রথম ঘাটা মারার পর লোকটা একটু থেমেছিল। এর পরের ঘাগুলো ছোট কিন্তু ঘন ঘন আঘাতে নেবে আসতে থাকল। গ্রানাইটের মূর্তি। খুব একটা নরম পাথর নয়। তাই কাজ একটু ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। যেভাবে লোকটা মারছিল, মনে হয় মাথাটাকে অক্ষত অবস্থায় নাবাতে চাইছে। গলার ক্ষত বেশ কিছুটা গভীর হবার পর লোকটা হাতুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ট্যাপ করে দেখল মাথাটা নড়ছে কিনা। এখনো নড়েনি। লোকটার মুখের হাসিটা অন্ধকারে মিশে গেল। আবার একইভাবে ঠুকঠুক করে ছেনি দিয়ে বিদ্যাসাগরের শিরশ্ছেদের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলল লোকটা।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে এমনি চলল। মাঝে মাঝে লোকটা মুখ ফিরিয়ে চৌরাস্তার চারদিক দেখে নিচ্ছিল। অন্ধকারে তেমন কিছু যে দেখা যাচ্ছে এমন নয়। কেউ যদি একান্তই এসে যায় নিজেকে যতটা পারে মূর্তির গায়ে মিশিয়ে দেবে এমনি প্ল্যান ছিল লোকটার। একটু রিস্ক থাকবেই। যখন হবে তখন দেখা যাবে, এমন একটা মনে ছিল। কিন্তু কেউ এলো না। মাথাটা এক সময় টুপ করে ওর বাড়িয়ে ধরা বাঁ হাতে বাতাবি লেবুর মত খসে পড়ল। লোকটা মইয়ের উপরে দাঁড়িয়েই এবার ব্যাগের মধ্যে ঢুকাল মাথাটা। হাতুড়ি আর ছেনি রেন কোটের পকেটে সেঁধিয়ে দিল। তারপর এক পা এক পা করে মই ধরে ধরে নিচে। মই টাকে ভাঁজ করে ডান হাত দিয়ে পাকড়িয়ে মোটর সাইকেলে উঠে ভটভট শব্দে চৌরাস্তা ছেড়ে শালিনী সিনেমা হলের পিছন দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বৃষ্টি এখনো ধরেনি। ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার মাথা হারিয়ে চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। লোকটার নিজের ডেরায় পৌছাতে লাগল আরও

মিনিটি পনেরো। একাই থাকে, দরজার চাবি হাতড়ে তালা খুলে ভিতরে এসে প্রথমেই পাথরের মাথাটাকে গামছা দিয়ে মুছল। ঘরের আরও অনেক হাত পা মাথার মধ্যে এক কোণে বসিয়ে দিল বিদ্যাসাগরের মাথাটাও।

লোকটার সমস্ত গতিবিধিতেই একটা নিশ্চিন্ততা, তাড়াহুড়া ছিল না কিছুতেই। সব কাজ সমাধা করে টানটান হয়ে বিছানায় শুতেই ঘুমিয়েই পড়ল বেশ, ঘুম ভাঙ্গল খুব ভোরে ফোনের শব্দে। হাত বাড়িয়ে ফোনটা কানে রাখল, চোখ তখনো বোঁজা।

শুনেছেন ?

কেন কি হয়েছে ?

আবার বিদ্যাসাগরকে অ্যাটাক করেছে। আগেরবার মুখে আলকাতরা দিয়েছিল, এবার আপনার বানানো মূর্তিটার মাথাটাই ভেঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। বাঙ্গালির আর কি রইল বলুন ?

তাই, বেশ হয়েছে। বিদ্যাসাগরের মুখে চুনকালি তো আর লেপতে পারেনি এবার।

কি বলছেন আপনি ? আপনার নিজের সৃষ্টি এইভাবে কেউ ধংস করল, আর আপনি –

কি লাভ বল, দিনকাল ভাল নয় সুবিমল। প্রতিবাদ করে নেতাদের কোপে পড়ব নাকি ? মাথাটা তো বাঁচাতে হবে, মাথা গেলে মানুষের কি থাকবে বলো।

অন্য প্রান্তে সুবিমল অসহিষ্ণু হচ্ছিল। বুড়ো হয়ে লোকটার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল, নাকি ভয়ে জুজু। নিজের শিল্প বাঁচানোর থেকে নিজের মাথা বাঁচাতে বেশী ব্যস্ত। অন্তত এর থেকে বেশী বাইট আশা করেছিলেন প্রবীন শিল্পীর কাছ থেকে। সকালের নিউজ আওয়ারের জন্য ক্যামেরা নিয়ে অরিন্দমকে পাঠাবে ভাবছিল, কিন্তু এরকম নিরাসক্ত শিল্পীর কাছ থেকে ব্রেকিং নিউজে দেওয়ার মত মশলা পাওয়া যাবে বলে মনে হল না। এর চাইতে ভাঙ্গা মূর্তির ছবি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখালেই বেটার।

সুবিমল ফোন ছেড়ে দিতে তপোধীর মিত্র বালিশ জড়িয়ে পাশ ফিরে শুলেন।

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী

বিল গেটসের বিপদ

অ্যাডেয়ারের মোড়ে বিল গেটসের সঙ্গে দেখা।

হঠাৎ চেনা মুশকিল। ফিকে নীল জিন্সের উপরে ফ্যাব ইন্ডিয়ার ঘিয়ে ফতুয়া। কাঁধে কোন ল্যাপ টপ ব্যাগও নেই। হাঁটু অবধি লুঙ্গি তুলে বিলের পাশে দাঁড়িয়ে একজন কফি খাচ্ছে, সে নিশ্চয় চিনতে পারেনি বিলকে। অবশ্য সাদা চামড়া জনিত সম্মান বজায় রেখে কফি খাচ্ছে নিঃশব্দে।

আমি কানের কাছে ফিসফিস করে বললাম, বিল ?

এই যাঃ, চিনে ফেলেছ ? মুখের হাসিটা স্বস্তি আর অস্বস্তির মাঝখানে ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলছিল।

আমি তো সাংবাদিক, স্কুপ করা যায় কিনা মাথায় খেলছিল। সবাই জানে বিল গেটস সারা বিশ্বের ভাল করার জন্য টাকা ছড়াচ্ছিলেন, কিন্তু দেউলিয়া হয়ে চেন্নাইয়ের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফিল্টার কফি খাবেন, এটা নেহাত বাড়াবাড়ি। সত্যিই কি আর পাঁচতারা হোটেলের কফি শপে বসার আর্থিক সামর্থ্য নেই বিলের ?

ভুলটা অবশ্য ভেঙ্গে গেল খুব শিগগির। পথচারী এক ভিখিরি সাদা চামরা দেখে ভিক্ষে চাইতে এসে গেছিল, বিল অম্লান বদনে তার বাটিতে ফেলে দিল একটা একশো ডলারের নোট।

চেন্নাইতে কি কোন কাজে ?

কাজ খুঁজতে এসেছিলাম, ভাল কিছু।

আপনি কাজ করবেন ?

করতে চাই, কিন্তু আমাকে নেয় না। মানে নেয়, কিন্তু আমি থাকলে কাজটা কেমন মেকি হয়ে যায়। তাই আর করতে পারি না। তবু খুঁজে বেড়াই, কেউ ভাল কোন কাজ করছে কিনা। কিছু টাকা দিতে পারতাম।

শুনেই আমার নোলা সকসক। ইস, আমার যদি এন জি ও থাকতো।

তবু তরবরালাম, আমি খুঁজে দেখবো বিল ?

খোঁজো, খোঁজো। সেটাই তো করছি সারা পৃথিবী ঘুরে। কিন্তু তবু হচ্ছে না।

কি হচ্ছে না বিল ?

শেষ হচ্ছে না টাকা। বেড়েই যাচ্ছে। কিছুতেই কমাতে পারছি না। ফ্যাসফেসে গলায় বললেন বিল। খুবই বিব্রত, হেরে যাচ্ছেন জীবনে প্রথমবার। টাকা যে টাকা আনতেই থাকবে, কি করে যে উনি ভুলে গেছিলেন !

সৌগত ভট্টাচার্য

তেল সংক্রান্তি

বাঁশের গায়ে একটা মোটা পেরেক পোঁতা। পেরেকের মধ্যে একটা প্যান্ট ঝুলে থাকে সারা বছর। এই প্যান্টটা গোবিন্দ বছরে এক দিন পরে, অন্য সময় লুঙ্গি পরে। শুধু প্যান্টটা ছাড়া বাকি শাড়ি জামা চেক লুঙ্গি দড়িতে ঝোলানো থাকে। কাজ বাড়ি ফিরে কিছু টাকা পয়সা সে ঝোলানো প্যান্টের পকেটে রেখে দেয় রোজ। এক বছর ধরে প্যান্টের গভীর পকেট খুচরো পয়সায় ভারী হয়ে ওঠে। তারপর কোনো এক চৈত্রের সকালে গোবিন্দ সেই প্যান্ট পরে টাউনের দিকে রওনা হয়।

টোটো কদমতলার মোড়ের সামনে নামিয়ে দিলে একটা বিড়ি ধরিয়ে লম্বা টান দেয় সে। চৈত্রের মাঝামাঝি খুব গরম না পড়লেও রোদের তেজ বাড়তে শুরু করেছে, কিছুটা হাঁটলেই টের পায় গোবিন্দ। যদিও শহরে যেন তার একটু বেশিই গরম লাগে। তাছাড়া জামা প্যান্ট পরার অস্বস্তি তো আছেই। বিড়ি বের করতে বারবার কোমরের কোচে হাত দেয় সে। পকেটআলা প্যান্টের সাথে সে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। গোবিন্দ প্যান্টের পকেট ব্যবহার করতে জানে না। শুধু প্যান্টের পকেটে খুচরো টাকা রাখতে জানে। বিড়িটা ফেলে পা দিয়ে পিষে আগুন নিভিয়ে স্টেশনের দিকে হাঁটা দেয়। শহর বলতে বাসস্ট্যান্ড থেকে স্টেশন এটুকুই সে চেনে। টাউনে আসতে গোবিন্দ ভালোবাসে না, কারণ তার গা থেকে যদি কেউ রক্তের গন্ধ পায় !

দশটার হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জারে গোবিন্দ জানালার ধারের সিট ছেড়ে পাশের দিকে একটা সিটে বসে। একজন যাত্রী পাশে বসলে সে একটু উসখুস করে ওঠে। গোবিন্দর মাঝে মাঝেই সন্দেহ হয় ওর গা থেকে কী রক্তের গন্ধ বের হয় ! শহরের যাত্রীদের পাশে কী ভাবে বসতে হয় গোবিন্দ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। পাশের লোকটা ফোনে কথাই বলতে থাকে। বছরে একদিনই পাঙ্গা থেকে টাউনে এসে ট্রেন ধরে হলদিবাড়ি যায় সে। বিমল সেদিন বলছিল, "এই টেরেন সোজা গিয়া চিলাহাটি হয়ে ওই দ্যাশে যাবে ... সব পাকা হয়া গেসে ..." "টেরেনে কি টিকিট কাটলেই হবে নাকি বর্ডার পারাপারের কাগজ লাগবে ?" গোবিন্দ বিমলের কাছে জানতে চাইছিল, বিমল ঠিক উত্তরটা জানে না। শুধু জানে ট্রেন চলবে দুই দেশের মধ্যে। বারো বছর আগে চলে এসেছিল ইন্ডিয়ায়, তারপর আর কোনো দিন পচাগড়ে ফিরে যায় নাই গোবিন্দ। কুকুরজান চাউলহাটি প্লেনঘাঁটি থেকে থেকে পচাগড়ের আকাশ দেখা যায় বৃষ্টি দেখা যায় ফসল দেখা যায় চৈত্রে পচাগড়ে আকাশে বাজ পড়ার শব্দ শুনে গোবিন্দ চমকে ওঠে। ওই পারে পচাগড়ের আকাশ দেখে এই পারে সে ঝড় জলের আভাস পায়।

এনজেপি-হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জার হলদিবাড়ি স্টেশনে থামলে গোবিন্দ ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফার্মে দাঁড়ায়। এই ট্রেনের হলদিবাড়িই লাস্ট স্টপেজ। হলদিবাড়ির পরই বাংলাদেশ। প্ল্যাটফর্মে প্যাসেঞ্জার নামিয়ে খালি ট্রেনটা সোজা বর্ডারের দিকে চলে যায়। লাইন বরাবর আরো সোজা কিছুটা গেলে চিলাহাটি। আবার কিছু পরে ইঞ্জিন কেটে সামনের দিকে লাগানো হয়। যেমন খাসির ধর থেকে মাথা কাটা হয়। তারপর গাড়িটা মুখ ঘুরিয়ে ফিরে আসে। বিমল এই লাইনটার কথাই বলেছিল গোবিন্দকে। গোবিন্দ ট্রেনের এই যাওয়া আর বর্ডারের থেকে মুখ ফিরিয়ে আবার চলে আসাটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে খুব মন দিয়ে দেখে। ইঞ্জিনটা বগিগুলো ছেড়ে চলে গেলে বগিগুলোকে গোবিন্দর রাস্তায় পড়ে থাকা মাথাহীন খাসির কথা মনে হয়। ট্রেনটা পঁ পঁ করে।

"গোবিন্দ আমার মালটা আগে ধর ..." নগেন চিৎকার করে বলে। কয়েক বছর হল পাঙ্গা ব্রিজ পাকা হয়েছে। পাঙ্গা ব্রিজের ফুটপাথে খোলা আকাশের নিচে প্রতি রবিবার খাসির দোকান দেয় নগেন বিমল সুনীলরা। পাঙ্গার লোকাল খাসির খরিদ্দাররা টাউনের লোক। "এই মালটা ঝুলায় তোর টা ধরব !" নগেনকে উত্তর দেয় গোবিন্দ। "কাস্টমার কখন থেকে দাঁড়ায় আসে, এ ব্যাটা

উল্টা গান ধরিসে।" গোবিন্দর হাতের ছুরি দিয়ে ব্রিজের পিলারে বেঁধে রাখা খাসির গলার দড়ি কেটে রাস্তায় শুইয়ে ছুরির উল্টোদিকের সূচালো দিক দিয়ে গলার নলি কেটে দেয়। খাসিটা চিৎকার করে ছটফট করতে থাকে। খাসি অসাড় না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত গোবিন্দ গলার নলিতে ধরে রাখা ছুরিটা স্ক্রু এর মত প্যাঁচ দিতে থাকে। পাঙ্গা ব্রিজ রক্তে ভেসে যায়, গোবিন্দর সারা শরীরে চোখে মুখে রক্ত ছেঁটে। সারা মাস বছর ধরে গা থেকে সেই রক্তের গন্ধ যায় না। "কী রে গোবিন্দ একটা মাল কাটলেই তোর সংসার চলিবে নাকী রে !" সুনীল আবার বলে। গোবিন্দ একটা বাঁশের মধ্যে উল্টো করে টাঙিয়ে খাসির ছাল ছাড়ায়, খাসির মাথাটা তখন ব্রিজের ওপর একটা পলিথিনে পরে আছে ... একটু দূরে।

"টেরেন টা বর্ডারের সমানে আইসেই খাসি হয়ে গেল ... মাথাটা আলাদা পাছাটা আলাদা ! মাথাটা পাছায় আসি লাগে।" মনে মনে বিড়বিড় করে গোবিন্দ। স্টেশনের পাশ দিয়ে এগিয়ে হুজুরের মেলার রাস্তা ধরে গোবিন্দ। মুসুর কবিরাজের বাড়ির রাস্তায় ঢুকতেই একটা চায়ের দোকান ছিল এই বার আর দেখছে না সে দোকানটাকে। কবিরাজের বাড়িটা আগের মতোই আছে। বাড়ির সামনে ভিড় করে আছে পেশেন্ট আর পেশেন্ট পার্টির বাড়ির লোকজন। কিছুটা ইতস্তত করে সে একটা প্ল্যাসটিকের চেয়ার টেনে বসে উঠনে ছাউনি দেওয়া দিকটায়, প্যান্টের পকেটে টাকাগুলোতে হাত দিয়ে বারবার দেখে নেয়। গোবিন্দের একটাই শঙ্কা তার গা থেকে কেউ রক্তের গন্ধ পাচ্ছে না তো ! মনে মনে ভাবতে থাকে সে। "বাড়ি কই ?" পাশে বসে থাকা লোকটা জিগ্যেস করলে গোবিন্দ উত্তর দেয়। লোকটা মুসুরের কাছে এসেছে মেয়ের জন্য তেল নেওয়ার জন্য। তেরো বছরের মেয়ের কোমরে ব্যথা কমে না, দাঁড়াতে পারে না। অনেক ডাক্তার বদ্যি করেছে সে। শেষে মুসুরের তেলে কিছুটা ভালো আছে। হার ভাঙার পেশেন্ট নিয়েও অনেকে এসেছে দূর দূরান্ত থেকে। মুসুর কবিরাজদের বাবা ঠাকুরদার ব্যবসা। বেঁটে মত একজন বলে, "আমার বাড়িতে ব্যথা ব্যাদনার জন্য এই তেল ছাড়া চলে না। ওর বাপ ঠাকুরদার আমল থেইকে আমরা আসি এই কবিরাজের কাছে। কাজও হয় তেমন ! পুরা সুপারসাস্ট !" "মুসুরের বাপ ঠাকুরদা সকলের নামই মুসুর কবিরাজ।" বলেছিল সুনীল। "দেশ ভাগের আগে পচাগড় বোদা তেঁতুলিয়া রংপুর থেকে প্রচুর লোক আসত ব্যথার তেল হাড় ভেঙে যাওয়ার তেল নেওয়ার জন্য। তখন তো একটাই দেশ ছিল। হাড় ভাঙলেও দেশ তো ভাঙে নাই তখন ! কী কন !" বলে মেখলিগঞ্জ থেকে তেল নিতে আসা নরেশ। "দেশ ভাগের পর কাঁটাতারের বেড়া বসি গেল আর ওই পারে তেল যাওয়া বন্ধ !" পাশে বসে থাকা বেঁটে লোকটা বলে। "এখনো হেব্বি ডিমান্ড পুব পাকিস্তানে ! পুরানা লোকরা এই তেলই চায় ! যদিও চাইলেই তো হবে না পাবে কই ! টেরেন্সপোর্টে পাঠানো যা ঝামেলা আর খরচা, তা থেইকা না পাঠানোই ভালো ! তারপরও যাকে পাঠাবেন তার হাত অবধি পৌঁছালে হয় !" একজন পেশেন্ট পার্টি বলে ওঠে। "গোবিন্দ মণ্ডল ... "কবিরাজের ঘরের ভেতর থেকে ডাক আসে। গোবিন্দ পকেটটা চেপে ধরে সবাইকে বলে, "তাইলে যাই ..." ব্যথা নাশক তেল নেওয়ার জন্য গোবিন্দ উঠে মুসুর কবিরাজের ঘরের দিকে যায়।

সন্ধ্যার ট্রেনে টাউনে ফিরে আসে গোবিন্দ। এক শিশি ব্যথার তেল নিয়ে টোটোতে চেপে বসে। টাউনের কদমতলার মোড় তার কাছে অন্য একটা দেশ। চৈত্রের সন্ধ্যায় টাউন ছেড়ে টোটো পাঙ্গার দিকে এগোতে থাকলে ফাঁকা হয়ে আসে চারপাশ। কৃষ্ণচূড়া চাঁপা গাছ এই রাস্তায় অনেক। পুটুস ফুটে থাকে সারা রাস্তা জুড়ে, দুইপাশে। যে পাঙ্গা ব্রিজে গোবিন্দ খাসি কাটে তার নিচে সরু জলরেখা চলে যায় দক্ষিণ দিকে। পাঙ্গার ধারে উঁচু জামিতেও চা বাগান তৈরি হয়েছে। কয়েক বিঘা জমি পেলেই লোকে বাগান করে ফেলছে। আশ্বিন মাসের পর থেকে আকাশ পরিষ্কার থাকলে দূরের বরফ ঢাকা পাহাড় দেখা যায়। রাস্তার দুই ধারে খেত আর চা গাছের বাগান। এই দশ বছরে গোবিন্দ দেখেছে ধানের জমি গুলো কেমন করে ছোট ছোট চা বাগান হয়ে গেছে। কিছুদিন সে এই পাতার বাগানে লেবারের কাজ ও করেছিল। টোটোটা একটা বাম্পে ঝাঁকুনি দেয়। তেলের শিশিটা শক্ত করে ধরে গোবিন্দ। শুধু তেল কেনার টাকাগুলোতে রক্তের গন্ধ ছিল কি না কে জানে !

তেল আনা হয়ে গেছে তাই আজ গোবিন্দ নিশ্চিন্ত। তেল নিয়ে ফিরে প্যান্টটা পেরেকের মধ্যে আবার ঝুলিয়ে

রাখে সে। আজ পকেট একদম ফাঁকা, প্যান্টটা আর ভারী নাই। রাতে খাওয়ার পর পাঙ্গা নদীর ধারের ছাপরা বাড়ির দাওয়ায় বসে একটা বিড়ি ধরায় সে। নদী থেকে হাওয়া আসে। গোবিন্দ একটা হিন্দি গান ধরে। গোবিন্দর পচাগড়ের রাতের অন্ধকার বৃষ্টি জোনাকি জোছনা হালালে কাটা মুরগির মাংস ঈদ সিনেমা হল হাফিজের দোকান এসব কথা ছেঁড়া ছেঁড়া হয়ে মনে পড়ে। তখন সীমা সাত মাসের পোয়াতি,বারো বছর আগের বৈশাখের ঝড় জলের রাতে সীমাকে নিয়ে এই থেকে দেশে পালিয়ে আসে গোবিন্দ। ওই দেশে ভ্রুণের জন্ম হলেও ইন্ডিয়াতে চরকডাঙ্গী হেলথ সাব সেন্টারে পিন্টুর জন্ম হয়। তারপর থেকে বারো বছর কেটে গেল। গোবিন্দ এখন পাঙ্গা ব্রিজে খাসি কাটে। অনেকবার ভেবেছিল কয়েকটা খাসি নিয়ে নিজেই কাটবে। কিন্তু টাকার জোগাড় করে উঠতে পারেনি বারো বছরেও। একবার ধারদেনা করে মুরগির দোকান দিয়েছিল তেমন চলে নাই। "আমার বাড়িতেই কিছুদিন থাক !" ওই দেশ থেকে আসার পর নগেন গোবিন্দকে বলেছিল। নগেন ছিল গোবিন্দদের দুঃসম্পর্কের আত্মীয়। পোয়াতি সীমার দিকে তাকিয়ে নগেনের মায়া হয়। নগেনই ওকে খাসির মাংস কাটার লাইনে নিয়ে আসে। এখানে হালালে মাংস কাটে না গোবিন্দ। খাসি প্রতি টাকা। সে টাকায় সংসার চলে না। রোববার বাদ দিয়ে বাকি দিন কামলার কাজ ঠেলা চালানো যখন যা পায় তাই করে। দুই বছর আগে পাঙ্গা নদীর ধারে একটা ছাপরা ঘর বানিয়েছে গোবিন্দ। ওদের ছেলে পিন্টুর বয়েস এখন এগারো। স্কুলে যায়, মিড ডে মিল খায়।

তেরো চোদ্দ বছর আগের চৈত্র সংক্রান্তির দিনের কথা। তখন সে থাকতো ওই দেশে। চৈত্র সংক্রান্তির দিন নগেন এসেছিল কুকুরজানের হাসিকান্নার মেলায়। গোবিন্দ আর সীমাও এসেছিল কাঁটাতারের ওই পারে। প্রতিবার চৈত্র সংক্রান্তির দিন দুই দেশের নো ম্যান্স ল্যান্ড পেরিয়ে কাঁটাতারের সামনে আসতে দেয় বিজিবি আর বিএসএফ। কাঁটাতারর দুই পাশে দুই দেশের মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে। নগেনের সাথে সেদিন দেখা হয়েছিল গোবিন্দর। নগেনরাও একসময় থাকত পচাগড়ে। গোবিন্দর বাবার বাল্য বন্ধু ছিল নগেন। ওরা বহুদিন আগে ইন্ডিয়ায় চলে আসে। ছোট বেলায় গোবিন্দ নগেনের খুব আদরের ছেলে ছিল। নগেন কাকার চোখের কোণে জরুল দেখে এত বছর পরও চিনতে পেরেছিল গোবিন্দ। এখন তো নগেন আর গোবিন্দ প্রতিবেশী। দুজনেই ইন্ডিয়ান।

ওই দেশ থেকে আসার পর থেকে প্রতি চৈত্র সংক্রান্তিতেই গোবিন্দ কুকুরজান বা টিয়া পাড়ার হাসি কান্নার মেলায় যায়। "একটা কথা কই পারলে একটু মুসুর কবিরাজের তেল নিয়া আসিস গোবিন্দ ! তোর ভাবি তো জানিসই কবে থেইক্যা বিছানায় !" হাফিজ চিৎকার করে গোবিন্দকে বলেছিল চৈত্র সংক্রান্তির দিন হাসিকান্নার মেলায় এসে কাঁটাতারের ওই পার থেকে। সেটা বছর চারেক আগের কথা। তারপর থেকে হাফিজ গোবিন্দর কাছে একই অনুরোধ করে, একটু তেল যদি সে এনে দেয়। মুসুরের তেলের দাম অনেক। সারা বছর গোবিন্দ এক প্যান্টের পকেটে ভর্তি খুচরা টাকা জমায় হাফিজের বিবির জন্য মুসুর কবিরাজের তেল কেনার জন্য। পচাগড়ে গোবিন্দ ছিল হাফিজের মুরগির দোকানের কর্মচারী। হাফিজ ওকে ছোট থেকে দোকানে রেখেছিল, ভাবি ওকে মায়া করত। হাফিজ সীমার সাথে বিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দিয়েছে। চৈত্র পাড়ায় গাজন যাওয়া আসা শুরু করলে একদিন গোবিন্দ সব খুচরা গুনে দেখে আরো দেড়শ মত লাগবে। প্রথমে কিছুদিন লটারির নম্বর কাটে। "ধুর শালা লটারি আমার ভাগ্যে নাই !" তারপর বাজার থেকে ধার নিয়েছিল সে। টানাপড়েনের সংসারে প্যান্টের পকেটের টাকায় কেউ কখনো হাত দেয়নি, না সীমা, না গোবিন্দ। সব টাকা জোগাড় হলে চৈত্র মাসে একদিন সে হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জার ধরে।

সীমার আজ উপোষ। পুরো চৈত্র মাস সে নিরামিষ খেয়েছে। আজ চৈত্র সংক্রান্তি চরকডাঙ্গীর মাঠে গজনের মেলায় সীমা মানত করেছে। চরকগাছ কাঠে সিঁদুর লেপা পুজোর জোগাড় সবেতেই সীমা ছিল। অনেকক্ষণ ধরে ঢাক বেজে যাচ্ছে। সন্ধ্যের আগেই শুরু হবে পিঠে বড়শি লাগিয়ে ঘোরা। গোবিন্দ যদিও আজ সকাল থেকে ব্যস্ত। "কী রে গোবিন্দ চল !" নগেন বলে। গোবিন্দ ওর এগারো বছরের ছেলেকে নিয়ে আজ কুকুরজানে হাসি কান্নার মেলায় যাবে। চরকডাঙ্গীতে যখন চরকের মেলা বসে একই দিনে একই সময় কুকুরজানে বর্ডারে হাসিকান্নার মেলা হয়। চরকডাঙ্গী ঠুটাপুকরী প্লেনঘাঁটি পেরিয়ে পিন্টু

বাবার সাইকেলের পেছনের কেরিয়ারে পা ঝুলিয়ে বসে দেখতে দেখতে কুকুরজানে মেলার মাঠের দিকে যায়। পাশে অন্য সাইকেলে নগেন। "কোনদিন এই মেলাটাও বন্ধ করি দিবে, দেখিস।" নগেন বলে। "দ্যাশে তো আর যাওয়া হবে না আমাদের তাও মেলায় তো একদিন পাড়ার মানসিগুলার সাথে দেখা হয়, তাও যদি বন্ধ করি দেয়।" গোবিন্দ বলে। গোবিন্দ সাইকেল থেকে নামে, ঘামে জামা ভিজে যায়। অনেক সকাল থেকে হাজার হাজার মানুষ এসে জড়ো হয়েছে কুকুরজানের বর্ডারে। গোবিন্দ ভিড়ে যেতে ইতস্তত বোধ করে – কেউ যদি ওর গা থেকে রক্তের গন্ধ পায়। বর্ডারের ওই পারে পচাগড়, শুধুই কালো কালো মাথার বিন্দু। যেন রোববারের খাসির মাথাটা আলাদা করে ব্রিজের ওপর রাখা। সকলের হাতেই কিছু না কিছু উপহার নিয়ে এসেছে মানুষ এ পরের বন্ধু আত্মীয়কে দেওয়ার জন্য। গোবিন্দ হাফিজের বিবির জন্য কয়েক বছর ধরে আনছে মুসুর কবিরাজের ব্যথা নাশক তেল। এদিন দুই দিকের মানুষকে কাঁটাতারের একদম সামনে আসতে দেয় দুই দেশ কিন্তু কাঁটাতার পেরোতে দেয় না, ছুঁতে দেয় না পরস্পরকে। কে যেন কানের পাশে ডাকে, "গোবিন্দ একটা বিড়ি দিবি ?" কাঁধের মধ্যে একটি হারমোনিয়াম ধুতি দিয়ে ঝুলিয়ে মেলায় এসেছে রাধনাথ। কাঁটাতারের বেড়ার ধার ধরে সে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করে যাচ্ছে। এত কোলাহলের মধ্যে রাধনাথের গান কেউ শুনছে না। "তোমার পোলার বিয়া হল ?" ঐপার থেকে চিৎকার করে বলে। এ পারে আসতে আসতে অন্য শব্দের মধ্যে কথা হারিয়ে যায়। কয়েকশ ফিট দূর থেকে ইন্ডিয়ায় বিয়ে হয়ে যাওয়া নিজের মেয়েকে দেখে আমিনার কান্নাই থামে না। কিন্তু কাঁটাতারের ভেতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যাবে না কাউকে। ওটা অন্য দেশে, অন্য দেশের মানুষ। সবার হাতেই একটা করে উপহারের ব্যাগ। "গরুটা কয়েক কিলো দুধ দেয় ..." হাওয়ায় ভেসে হারিয়ে যায়। কাকে বলা কার উদ্দেশে বলা কাঁটাতার খোঁজ রাখে না।

ভিড়ের মধ্যে পিন্টুর হাতটা শক্ত করে ধরা, গোবিন্দ অন্য হাতে হাফিজের জন্য আনা মুসুর কবিরাজের ব্যথা নাশক তেল। ঠা ঠা রোদে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিরাট মাঠ তার মাঝে একটা আকাশ প্রমাণ কালো কাঁটাতারের বেড়া। এপারে কুকুরজান ওপারে পচাগড়। "বৈশাখে বুলবুলির বিয়া, আইস ..." বলে তারেক একটা কার্ড আর একটা পিঠের পুটুলি ব্যাগে ভরে ছুঁড়ে দেয় পচাগড়ের দিকে। আজহার সেই প্যাকেট লুফে নেয়। হাসি কান্নার মেলায় এই কয়েক ঘন্টার জন্য কাঁটাতারের ওপর দিয়ে উপহার দেওয়া নেওয়া চলে। "যা শালা আমারটা আটকায় গেল ..." হামিদুল ওই দিক থেকে কিছু একটা ছুড়েছিল সেটা কুকুরজানের জামিন পর্যন্ত আসতে পারেনি কাঁটাতারে আটকে ঝুলছে। পিন্টু বায়না করে আইক্রিম খাওয়ার। একটা কাঁটাতারের দুইপাশে শুধুই বিন্দু বিন্দু ঘামের মত মাথা আর মাথা। সব মাথার রং এক। একটা করে ব্যাগ ছুঁড়লে হো হো ... করা দুই দেশের মানুষের গলাটা শব্দে ভেসে যায় কুকুরজান আর পচাগড় । রাধানাথ কারো জন্য আসেনি হারমনিয়াম বাজিয়ে গান করাই তার উপহার সকলের জন্য। শুধু গান গেয়েই বাড়ি ফিরবে সে। নগেন অনেক দূর থেকে ঘামতে ঘামতে এসে গোবিন্দকে জিগ্যেস করে "হাফিজকে পাইলি ?" "না তো" গোবিন্দ উত্তর দেয়। "ওরে একটু আগেই দেখালাম ওই পাকে !" গোবিন্দ এক হাতে পিন্টু অন্য হাতে ব্যথার তেল নিয়ে ভিড় ঠেলে রওনা হয় নগেনের বলে দেওয়া জায়গায় হাফিজের খোঁজে।

কাছাকাছি কোনো গ্রাম থেকে গাজনের ঢাকের শব্দ কানে আসছে গোবিন্দর। বেলা প্রায় শেষ হয়ে আসছে। পচাগড়ের দিকে সূর্য হেলে যাবে আরেকটু পর। এখন প্রবল ঢাকের শব্দে নিশ্চয়ই দুজন মানুষকে পিঠে বড়শি বেঁধে চরক কাঠে ঘোড়ানো হচ্ছে। "গোবিন্দ ওই গোবিন্দ ... আমি এইখানে ... এ দিক আয় ..." হাফিজের গলা চিনতে ভুল হয় না গোবিন্দর। কাঁটাতারের এপারে ওপারে দুইজন দাঁড়ায়। কাঠি আইসক্রিম হাতে দাঁড়িয়ে থাকা পিন্টুকে দেখে হাফিজ চোখের জল ধরে রাখতে পারে না। জোর গলায় হাফিজ বলে, "সীমা কেমন আছে ?" ততধিক জোর গলায় গোবিন্দ বলে, "ভালোওওও ..." চিৎকার কোন দেশে মিলিয়ে যায় কেউ বোঝে না। হাফিজ গোবিন্দদের দিকে একটা ব্যাগ ছুঁড়ে দেয় কাঁটাতারর উপর দিয়ে, বলে, "নে সীমা রে দিস তোরা সবাই খাইস !" গোবিন্দ দেখে হাফিজ ইলিশ মাছ পাঠিয়েছে। দূরের গাজনের বাজনার শব্দ তীব্র হয়ে ওঠে। গোবিন্দ

পিন্টুকে কাঁধে নেয় হাফিজকে পিন্টুর মুখ দেখানোর জন্য। হাফিজের সাথে দেখা করানোর জন্যই পিন্টুকে গোবিন্দ নিয়ে আসে। এবার মেলা শেষ হওয়ার সময়। পিন্টুকে কাঁধ থেকে নামিয়ে ব্যাগে করে আনা মুসুর কবিরাজের ব্যথা নাশক তেলটা ব্যাগ শুদ্ধ ছুঁড়ে দিয়ে গোবিন্দ বলে, "ভাবিকে দিয়ে দিওওও ... ব্যথা থাকবে না আর ..."

হাফিজ গামছা পেতে দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু তেলর ব্যাগটা হাফিজের কাছে পচাগড় পৌঁছায়নি। কাঁটাতারের মধ্যে শয়ে শয়ে আটকে থাকা ব্যাগের সাথে গোবিন্দর আনা তেলের শিশি শুদ্ধ ব্যাগটা কাঁটাতারে আটকে যায়। না এপার, না ওপারে পৌঁছাতে পেরেছে। ঠিক মাঝখানে কাঁটাতারে ঝুলে থাকে। পিন্টু আর গোবিন্দ ফ্যালফ্যাল করে ব্যাগটার দিকে তাকায়। বর্ডারের ওই পর থেকে হাফিজ কাঁটাতারে আটকে থাকা ব্যাগটা দেখে অসহায়ের মত। সূর্য ডুবে আসছে প্রায়। দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী কাঁটাতারের সমানে থেকে মেলায় আসা মানুষদের সরিয়ে দিতে থাকে। বাড়ি ফেরার আগে ওরা দেখে ঝুলন্ত ব্যাগটার থেকে শেষ বিকেলে মুসুর কবিরাজের ব্যথা নাশক তেল টপ টপ করে কাঁটাতারের গা বেয়ে চুঁইয়ে পড়ছে ... তেলে ভিজে যাচ্ছে কাঁটাতার ... কান্নার মত ...

CATERING
For Any Party
Contact : 734-892-2972

Authentikka
Indian Cuisine
42070 Ford Rd, Canton, mi 48187. Ph: 734-892-2997

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

সরীসৃপের মৃদু স্বর

তার বয়স হল ছাব্বিশ বছর। স্বাস্থ্যবান এক যুবক। আশা করা যায় খুব শিগগিরই সে বাগানে বেরোনোর মতো যথেষ্ট বল পাবে শরীরে। অন্যান্যদের মতো তারও বাগানের প্রতি অগাধ আস্থা। তার দিকে তাকিয়ে বিশেষ কিছু না বুঝেই মাথা হেলিয়ে লোকজন বলে, "আর কিছুদিনের মধ্যেই তুমি বাগানে বেরিয়ে বসতে পারবে হে।" বাগানটি বিশাল। তার চারদিকে প্রাচীন ফারের পাঁচিল – ঘন অন্ধকারময়। সেইসব ফারগাছের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে থাকা ডালপালার অনেক গভীরে, ছায়াচ্ছন্ন আঁধারে, বাগানের জীবজগৎ থেকে বেশ দূরে সে এসে বসতেই পারে। হয়তো এইখানেই জীবনের রহস্য পরিস্কার হয়ে যাবে তার কাছে। সেই যেমনটা হয়েছিল আদিম মানব-মানবীর। চারপাশে গাছ, মাটি আর ঘাসের নরম, নিরপেক্ষ উপস্থিতিতে প্রথম মানুষ কত সহজে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছিল। তার প্রথমবারের বাগানে বেরনোর অভিজ্ঞতা খুব অদ্ভুত। তার স্ত্রী যখন তাকে নুড়ি বিছানো পথ ধরে আলোছায়ার মধ্যে দিয়ে হুইল চেয়ার ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল তার তখন নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। ছোটবেলায় সে সামনের দিকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে শরীরটাকে বাঁকিয়ে দিত। দু পায়ের গোড়ালির ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিত মাথাটা। মাটির কাছাকাছি থেকে ওপরে তাকালে চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যেত সারা পৃথিবী। বিরাট আকাশ, গাছের মাথায় মাথায় সবুজ ঢেউ, সবকিছু অস্বীকার করে ফুলেদের মাথা নাড়তে থাকা। চলমানতা। তার প্রথম বাইরে বেরনোর দিনটিতে হাওয়া বইছিল মৃদুমন্দ। কিন্তু সে তার শরীরের গভীরে ঠিক টের পেয়েছিল সেই ধীর সমীরণ। বাতাসের আলতো ছোঁয়ায় শিউরে উঠেছিল তার নাভিমূল।

সেদিন তার বৌ তাকে বাগানে নিয়ে যাবে বলে হুইল চেয়ার ঠেলতে থাকল। তার রোগা আর নরম হাতে সে কাজটা যে খুব মসৃণভাবে হল তা নয়। তবে সে কোন অভিযোগ জানাল না। বলল না যে এর থেকে নার্স এর সঙ্গে বেরোলেই ভাল হত। তাহলে কষ্ট পেত সেই মেয়ে। তার পছন্দের জায়গাটিতে এসে সে হুইল চেয়ারের ব্রেক আটকে দিল। সারা সকাল সে এই একটি জায়গাতেই কাটাবে। সেই প্রথম। এখন তো রোজই সে এখানে এসে বসে। প্রচুর পড়ে। কিন্তু হঠাৎ করে তার মনোযোগ চলে যায় পায়ে চাপা দেওয়া কম্বলে। কম্বলের তলায় যেখানে তার একটি পা থাকার কথা সে জায়গাটা এখন কেমন যেন গর্তমতো হয়ে আছে। তার পাশে তার অন্য পা। কম্বলটা কিছুটা লটপট করছে হাওয়ায়। সেইদিকে তাকিয়ে তার মনে হতে লাগলো তার কোন পাই যেন নেই। সেই অনুভূতিটা ক্রমশ পায়ের পাতা থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত উঠে আসতে লাগল। কয়েক মিনিট মাত্র। তারপরেই সে আবার ডুবে গেল তার বইতে। এই পা না থাকার চিন্তাটা সে কখনো নিজের মনের ভিতরে ঢুকতে দেয় না। শারীরিকভাবে বুঝলেও মনে মনে চিন্তাটা দূরে রাখে। টের পায় যে চিন্তাটা তার দিকে এগিয়ে আসছে দ্রুত, একটা কালো ঢেউয়ের মতো। এখুনি আছড়ে পরবে। গুঁড়িয়ে দেবে তার সবকিছু। কিন্তু ঠিক সময়ে সে সেই ঢেউয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়। সরিয়ে নেয় নিজেকে। ঢুকে পড়ে বইয়ের মধ্যে। এ ব্যাপারটা বেশ কয়েকবার হল। সে বুঝে গেছে এখন। নিজের একটি পা না থাকার ভাবনাটা সে এভাবেই খুব কাছে আসতে দেবে। যাতে সে যখন বাগানে একলা তখনই সেটা তাকে ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু প্রতিবারই তাকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলার মুহূর্তে সে ঘুরে দাঁড়াবে। ধীরে ধীরে এটাই তার অভ্যেস হয়ে যাবে। অভ্যেস আশ্বাস দেয়। আর এই অভ্যেসের আশ্বাস থেকে একরকমের মনের জোর তৈরী হয়ে যায়। চিন্তাটা নিজের ভেতরে না প্রবেশ করতে দেওয়ার অভ্যেসটা এমনই জোরালো হয়ে উঠবে ক্রমশঃ যে চিন্তার অনুভূতিটাই আর থাকবে না। তখন সে আবিষ্কার করবে যে সে যা চাইছিল তা করতে পেরেছে। সে ভাবতে শুরু করে দেবে যে আগাগোড়াই সে এমনই ছিল। তখন আর তার পা না

থাকার চিন্তা তাকে গ্রাস করে ফেলতে পারে এই ভয়টা থাকবে না।

এক দু সপ্তাহ পরে তাকে আর সবসময় এতো বই পড়তে হবে না। সে তখন বই নামিয়ে রেখে বাগানের চারপাশটা উপভোগ করতে পারবে। হাওয়ায় ফার গাছের ডালপালা দুভাগ হয়ে যায়, ঠিক যেন ছোটছেলের নরম রেশমী চুল। টেলিফোনের তারের ওপর দিয়ে একপা একপা করে চলে ছোট পাখীগুলো। নাধরকান্তি পুরুষ ঘুঘু তার ধূসর, শৌখিন চেহারার সঙ্গিনীর পেছনে পেছনে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরতে থাকে – কামনায় ভারী তার ডাক। এসব দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে আনন্দে কাটাতে পারবে সে এই সময়টা। তার বৌ সেলাইবোনা নিয়ে এসে বসে তার পাশে। কদাচিৎ তারা কিছু কথাবার্তা বলে। কিন্তু বেশীরভাগ সময়েই ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায় কোন কথা না বলে। শুধু তার বৌয়ের হাত চলতে থাকে হালকাভাবে। পাখীদের নরম চলাফেরার মতো। সে হইল চেয়ারে মাথা হেলিয়ে আধবোঁজা চোখে আকাশ দেখে। ঝাপসা, অস্পষ্ট। কখনো কখনো বাগানের গাছপালার দিকে চোখ চলে যায় তার। কিছু একটা দেখতে পেয়ে হেসে ওঠে। তার হাসির শব্দে নিস্তব্ধতা টুকরো টুকরো। বেলা এগারোটা নাগাদ তার বৌ সেলাই নামিয়ে রেখে বাড়ীর ভিতরে যায় চা আনতে। তার পায়ের তলায় শুকনো পাতার খচমচ শব্দ। সূর্যের আলো এসে পড়েছে বাগান থেকে বাড়ীর ভিতরে যাওয়ার রাস্তায়। হইল চেয়ারে বসে তার বর দেখে তার এই চলে যাওয়া। কত সহজ ভঙ্গী! যেন তার নিজের পেশী ব্যবহার করার দরকারই পড়ে না। সূর্যের আলোই তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে সেরে উঠছে। তার চোখের স্থির দৃষ্টিতে, মুখমণ্ডলের প্রসন্নতায়, হাতের তালুর উপরিতলে চলছে ধাতুর তেতে ওঠা আর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া।

এভাবেই চলছিল। তারপর একদিন তার বৌয়ের মাথার পাশ দিয়ে একটা বড়োসড়ো পঙ্গপাল গোঁ গোঁ করে উড়ে গেল। বৌ চমকে উঠল। তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেই তার সেলাইয়ের জিনিসপত্র সব গেল ছড়িয়েছিটিয়ে। নিচু হয়ে সে কুড়োতে লাগল ছুঁচ, সুতো ইত্যাদি। তখনও ভয়ে কাঁপছে সে। তার রকম দেখে কর্তাটি হাসতে লাগল। বৌটি চা আনতে ভিতরে গেলে সে আবার বই পড়ায় মন দিল। একটু পরে তন্দ্রামতো আসায় বই রেখে দিল। লক্ষ্য করল তার বৌয়ের গোলাপী সুতোর পড়ে আছে গোলাপের বিছানায়। তাড়াহুড়োয় ফেলে গেছে আর কি ! বৌয়ের একটু আগের সেই আঁতকে ওঠার কথা ভেবে নিজের মনেই হেসে ফেলল সে। আর ঠিক তখনই তার নজরে এল একটি মুখ। পরিণত পুরুষের মুখের মতো ছোট্ট একটি মুখ, – ভয় আর বিস্ময়ের মাখামাখি সেই মুখে। তার চোখের সামনে বসে আছে ভয়ে অসাড় একটা বিরাট পঙ্গপাল। মুখখানা দেখে মজা পেল সে। দুঃখী, দুঃখী, গম্ভীর ! যেন ডিজনি কার্টুনের ছবি থেকে উঠে আসা ছোটখাটো এক মানুষ। খুব ভয়ে ভয়ে সেটা সামান্য নড়েচড়ে বসল। পুরনো, ঘুনধরা বর্মের মতো খোলসের ভিতর তার বিচিত্র শরীর। পঙ্গপাল যে এমন হাস্যকর দেখতে তা সে আগে বোঝে নি। বুঝবেই বা কি করে ? সাধারণত তাদের ঝাঁকেই দেখতে পাওয়া যায়। শস্যের ক্ষেতের দিকে দলেদলে ধেয়ে আসে পঙ্গপালেরা। কে আর তাদের মুখের কাছে গিয়ে তাকিয়ে দেখে ?

পঙ্গপালের মুখখানা অনেকটা মানুষের মতো সন্দেহ নেই। সে মুখে অভিব্যক্তিও ফুটে উঠছে। কিন্তু পঙ্গপালের শরীরটিকে শরীর বলা চলে কিনা তা ভাবার বিষয়। মানুষের সঙ্গে পঙ্গপালের বহিরঙ্গের মিল ওই মুখেই শুরু আর মুখেই শেষ। তার শরীরটা যেন দেশলাইকাঠতে জড়ানো একটা পাতলা কাগজ। বাচ্ছা ছেলেদের বানানো কাগজের এরোপ্লেনের মতো। আর পাগুলোরই বা কি ছিরি ? পেছনের পা দুটো করাতের দাঁতের মতো, যেন ভাঙা ক্রেনের অংশবিশেষ। আর সামনের পাদুটো মেয়েদের চুলের কাঁটা দুভাগে বেঁকিয়ে দিলে যেমন দেখতে লাগে ঠিক সেই রকম। সেই মুহূর্তে পঙ্গপালটা তার সামনের একটা পা ধীরে ধীরে তুলে মাথার পাশে নিয়ে এসে বাঁ দিকের শুঁড়-টা আস্তে করে নামিয়ে দিল। মানুষ যেমন রুমাল দিয়ে ভুরুর ঘাম মোছে সেইরকম। এবারে তার পঙ্গপালটার প্রতি খুব কৌতূহল হল। সে তার হইল চেয়ারে আর একটু ঝুঁকে বসল পতঙ্গটিকে ভাল করে লক্ষ্য করবে বলে। পঙ্গপালটা বুঝতে পারল সেটা। আর তার শক্ত, কাটা কাটা বর্মের নীচে হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি দেখে সে অবাক হয়ে গেল। হৃৎপিণ্ড খুব দ্রুত ওঠাপড়া

করছে। নিজের চেয়ারে সে একটু সরে বসল যাতে পঙ্গপালটা এতো ভয় না পায়।

নিজের অস্তিত্ব জানান না দেওয়ার জন্য সে নড়াচড়া যতটা পারে কম করে খুব মন দিয়ে পঙ্গপালটাকে দেখতে দেখতে তার লড়াইটা বুঝতে পারল। পতঙ্গটা নিজের পেশীর দিকে সবটুকু মনঃসংযোগ করছে। পর্যাপ্ত শক্তি সংগ্রহ করে সেই শক্তির সবটুকু পাঠাচ্ছে তার পেছনের পা এর দিকে। সেই পা আর শরীরে সংযোগস্থল কেঁপে উঠছে। কিন্তু পঙ্গপালটা যেখানে ছিল সেখানেই স্থির। বেশ কয়েকবার তার এই চেষ্টা বিদ্যুতের মতো বয়ে গেল তার শরীর দিয়ে। কোন ফল হল না। বেশ কিছুবার ব্যর্থ চেষ্টার পরে আশ্চর্য্যজনকভাবে সে কয়েক পা এগোতে পারল। জমির ওপর দিয়ে নড়বড়ে ভঙ্গীতে কিছুটা লাফানোর মতো করে কয়েক পা এগোতে সফল হল সে। তারপর একদিকে কাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে শুঁড় দুটো তার দিকে উঁচিয়ে। নরম মাটিতে হাত দিয়ে হাতড়ে বেড়াল কিছুক্ষণ। কনুই বাঁকিয়ে অনেক কসরত করল। তারপর একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে আবার সোজা হয়ে বসল। আবার নিজের জায়গা থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখতেই সে বুঝে গেল পতঙ্গটির সমস্যাটা কোথায়। তার আর এই পঙ্গপালের সমস্যা একই। পোকাটা তার একটা পা হারিয়েছে। তার বাঁ পায়ের উপরের দিকের লম্বা অংশটা, যেটা কিনা তার পা আর শরীরের সংযোগস্থল, সেটা ঠিকই আছে। আর সেই অংশের শেষে যেখানে তার পা থাকার কথা তার জায়গায় স্পষ্ট, গোল একটা গর্ত।

পঙ্গপালের অখণ্ড মনসংযোগ আর নিরন্তর ব্যর্থ প্রয়াস দেখতে দেখতে সে তার সঙ্গে একধরণের একাত্মতা বোধ করল। এই অনুভূতিটা সে নিজেকে দিয়ে ভালভাবে বোঝে। পা টা যেখানে থাকার সেখানেই তো আছে। শুধু তুলতে হবে সেই পাটা। পায়ের উপরের অংশটা নড়ছে, কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে চলতে পারছে না। কেন ? সে আবার চেষ্টা করে। মস্তিষ্কে বার্তা পৌঁছয়। সেখান থেকে পায়ের দিকে তড়িৎগতিতে পৌঁছে যায় সেই সংবাদ। পাটি তোলার জন্য প্রস্তুত তার পেশী। কিন্তু হাওয়ায় কাঁপতে থাকে তার উদর আর পায়ের সংযোগকারী অংশটি – তুলে ধরার জন্য কিছু তো নেই। মাথা নেড়ে হেসে ওঠে যুবকটি। সে খুব ভাল করে জানে পঙ্গপালের মনের মধ্যে কি ওঠাপড়া চলছে। বাড়ীর দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে, "শিগগির এস। দেখে যাও। তোমার আর একজন রুগী হাজির হয়েছে।"

"কি হলটা কি? চা নিয়ে আমি আসছি।" "আরে এক্ষুণি এস। তাড়াতাড়ি।"

"কি ব্যাপার ?" বিরক্তিমাখা চোখে পোকাটার দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে। "তোমার পঙ্গপাল"

উত্তর শুনে সে খুব জোরে না হলেও আর্ত চিৎকার করে এক লাফ দেয় তার গিন্নি। "আরে অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। পঙ্গপালটা চলতে পারে না। আমারই মতো। ও তোমার কি করবে ? তুমি যখন ওটাকে এক ঝটকায় সরাতে গেছো তখন নিশ্চয়ই বেচারীর একটা পা ভেঙে দিয়েছো।"

"হতেই পারে না।" পঙ্গপালটার প্রতি তার ঘেন্নার সীমা নেই। কিন্তু কাউকে আঘাত করতে তার চাইতেও বেশী বিতৃষ্ণা তার। "আমি হাওয়ায় হাতের ঝাপ্টা দিয়েছি শুধু। ওটার গায়ে হাতই দিই নি। পা ভেঙে দেওয়া তো দূরের কথা।"

"বেশ বেশ। তাহলে এটা অন্য একটা পঙ্গপাল। কিন্তু এটার একটা পা নেই। দেখো একবারটি। ও জানে না যে ওর পা-টা শরীরের যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। হে ভগবান ! আমি খুব ভাল করে বুঝতে পারছি ওর অনুভূতিটা, জানো ? আমি দেখছি তো ওটাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। সত্যি কথা বলতে কি একটু গা শিরশির করছে। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার আর এই পতঙ্গতার অভিজ্ঞতা একই রকম।"

তার বৌ সামান্য হাসল। যেন তার ভাললাগার কিছু একটা ঘটেছে। তারপরেই সে নিজেকে গুছিয়ে নিল আবার। সামনে এগিয়ে এসে কোমরে হাত দিয়ে অনেকটা ঝুঁকে দাঁড়াল। "যদি চলতেই না পারে –" "ভয় পেয়ো না। হাত দাও"

"আহা বেচারী !" বৌটির গলার স্বর মমতায় ভরা। "চলতে পারে না।"

তার বর ঠাট্টা করে বলে উঠল, "নিজের প্রতি করুণা করতে শিখিয়ো না ওটাকে।"

এবারে সে হেসে ফেলল জোরে জোরে। পঙ্গপাল তার গম্ভীর আর হাস্যকর মুখে চেয়ে রইল বৌটির দিকে। সে বলল, "মজার বয়স্ক মানুষের মতো এর মুখখানা! কিন্তু কি হবে এখন এর ?"

"জানি না।" যেহেতু তার নিজের আর পঙ্গপালটার পরিস্থিতি কিছুটা একই তার কর্তব্য বা দয়ার দেখানোর দায় কোনটাই নেই। "হয়তো ওর আর একটা পা গজাবে। টিকটিকিদের যেমন লেজ খসে গেলে আবার নতুন লেজ গজায়।"

"টিকটিকিদের কথা আলাদা। আমার মনে হয় এটাকে বেড়ালে খাবে।"

"তুমি বরং ওর জন্য আর একটা হুইল চেয়ার তৈরী করাও। তাহলে আমাদের দুজনকেই একসঙ্গে ঠেলে বাগানে নিয়ে আসতে পারবে।"

"ঠিক বলেছ।" হাসি ঝরে পড়ে বৌটির গলায়। "শুধু ওর জানায় একটা চাকা লাগানো কাঠের ক্ষুদে পাটাতন হলেই চলবে।"

"কিংবা আমরা ওকে ক্রাচ এর ব্যবহারও শেখাতে পারি। আমি নিশ্চিত যে চাষীরা জেনে খুশী হবে যে আমরা পঙ্গপালটাকে সচল রেখেছি।"

"বেচারী !" বৌটি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে মাটিতে পড়ে থাকা পতঙ্গটির অবস্থা দেখে আরো একবার বলে উঠল। হঠাৎ ছোটবেলার মতো ঔৎসুক্য জেগে উঠল তার মনে। একটা সরু গাছের ডাল দিয়ে সে আলতো করে পঙ্গপালটাকে খোঁচা দিল। "মজার কথা হল তোমাদের দুজনেরই একই পা নেই। বাঁ পা। "বরের দিকে মুখ তুলে চেয়ে হাসল সে। তার কথায় সেও হেসে ঘাড় নেড়ে সায় দিল।" আমাদের দুজনের তারপর আরো একবার বলে উঠল "আমাদের দুজনের – ঠিকই।"

সে হাসছিল। আর হাসতে হাসতে সে লাঠিটা দিয়ে একটু বেশী জোরেই খোঁচা দিয়ে ফেলল পঙ্গপালটাকে। সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবে। আর ঠিক তখন বাতাসে কাগজের ফরফর। পঙ্গপাল উড়ে গেল। বৌটি হাতে লাঠিটি ধরে দাঁড়িয়েই রইল। হতচকিত। পতঙ্গটার ভয়ে কিছুটা ভীত তখনও। বাচ্ছাদের মতোই বিচলিত ও বিভ্রান্ত। "কি হল ? আরে হলটা কি ?"

মুহূর্তের নীরবতা। যুবকটি ধমক দিল তার স্ত্রীকে, "কি আবার হবে ? বোকার মতো কথা বোলো না।"

তারা দুজনেই সাময়িকভাবে ভুলে গিয়েছিল যে পঙ্গপাল উড়তে পারে।

নাদিন গর্ডিমার – নাদিন গর্ডিমারের জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকার জোহেন্সবার্গে ১৯২৩ সালের ২০শে নভেম্বর। ১৯৯১ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর লেখায় দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষজন ও তাদের জীবন চিত্রিত হয়েছে তার প্রায় সবটুকু বর্ণময়তায়। তাঁর ছোটগল্পগুলি বহুস্তরীয়। তাঁর লেখা পাঠকদের এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। আমাদের বিশ্বাস আর কাজের মধ্যে যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় – রঞ্জিতার জন্ম ও বেড়ে ওঠা পশ্চিমবঙ্গে। গত দুইদশক ধরে আমেরিকা প্রবাসী। পেশায় শিক্ষিকা। সাহিত্যের প্রতি প্রাণের টান ছোটবেলা থেকেই। বিগত সাত বছর ধরে "বাতায়ন" বলে একটি সাহিত্যপত্রিকার গোষ্ঠী সম্পাদক রঞ্জিতা। "বাতায়ন" একটি আন্তর্জাতিক পত্রিকা। বাংলা, ইংরাজী দুইভাষাতেই লেখা ও পড়ার অভ্যেস।

শ্রীপর্ণা মিত্র মজুমদার

খাতার শেষের পাতা

স্কুল পড়ুয়া যে কোনো ছাত্র ছাত্রীর কাছেই খাতার শেষের পাতার গুরুত্ব অসীম। মনের যে কোনো অভিব্যক্তির বহিঃ প্রকাশ হত ওখানে। কি রাগ, কি দুঃখ, কি আনন্দ সব কিছুই লিপিবদ্ধ করতাম ঐ খাতার last page এ। বিভিন্ন রকম খেলার অর্জিত points পর পর লিখে যোগ করা, ফুল, পাখি, গাছ, মাছ, মানুষের মুখের ছবি আঁকা থেকে শুরু করে কাটাকুটি খেলা, কিছু কবির নামহীন প্রেম প্রেম ছড়া (যেগুলি তখন মনে হত নিষিদ্ধ type), বন্ধু বা পরিচিত কারো ফোন নম্বর বা ঠিকানা, অংকের রাফ কাজ, সদ্য প্রেমে পড়া বন্ধু ও তার boy friend এর নাম লিখে FLAMES খেলা সব থাকত শেষ পাতায়। শিক্ষিকাদের signature নকল করার প্রবল প্রচেষ্টাও থাকত সেখানে। সবে মিলে প্রাচীন সভ্যতার দেওয়ালের hieroglyphics গোটা page জুড়ে।

এ যেন যুগ যুগ ধরে চলে আসা এক পরম্পরা। আমি লিখতাম, আমার মেয়ে লেখে, এর পরে হয়ত ওর মেয়েরাও ....। যে কোনো জীবিকাতেই বিশেষ করে শিক্ষকতায় খাতা, কলম শিক্ষার্থীদের যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন শিক্ষক বা শিক্ষিকারও। স্কুলে অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ করে common room এ বসে খাতা check করতে হয় আমাদের শিক্ষার্থীদের আড়ালেই। এ করতে গিয়েই হঠাৎ করে একদিন চোখ পরে গিয়েছিল শেষ পাতায়। সেখানে চোখ পড়তেই এক লাফে যেন চলে গিয়েছিলাম ত্রিশ বছর আগের ফেলে আসা দিনগুলিতে। আরে আমরাও তো এমনই করতাম। এমন লিখতাম, এমন আঁকতাম। কোনো কোনো সময় তো page ছিঁড়ে চোর, পুলিশ, বাবু, ডাকাতও খেলেছি। জানিনা কেন সবাই ভাবতাম ঐ শেষ পাতাতে যথেচ্ছাচার চালালেও সেটা কোনোদিন ও কারো নজরে আসবে না। লেখাগুলো সাধারণত সরল রেখায় হত না, north west থেকে south east এ, আবার কখনও south west থেকে north east এ।

পরীক্ষার রুটিন, হাতের ছাপ মানে খাতায় হাত পেতে পেন দিয়ে তার out line, পছন্দের গানের কলি, নায়কের নাম + নায়িকার নাম এসবও জায়গা করে নিত সেখানে। মনে পড়ে, স্কুল ছেড়ে তখন আমি কলেজ। এক madam এর ক্লাস করতাম, যিনি পড়াতেন আর বলতেন, "বুঝেছ"/"বুঝতে পেরেছ"/"বুঝতে পারলে"/"বুঝেছো তো"। উনি যতবার বলতেন আমি ততবার একটা করে দাগ দিতাম শেষের পাতায়। ক্লাস শেষে গুনতাম কটা দাগ হল।

এখন তো আর খাতাতে তেমন হয় না। এখন কি হয় ? স্কুল থেকে ফেরার পথে দোকান / বাজার থেকে কি কি নিতে হবে সেগুলি লিপিবদ্ধ হয় ঐ last page এ। যদিও অনেকে এ কাজটিও এখন মোবাইলেই সারেন। ফোন নম্বর ও তাই, direct save হয়ে যায় contact list এ।

তবে একবার এক শিক্ষিকা দিদির কাছে শুনেছিলাম যে ওদের স্কুলের এক ছাত্রী (কৃষ্ণবর্ণা ও ঈষৎ স্থূল) খাতার শেষের পাতায় লিখে রেখেছিল, "আমাকে কেউ ভালোবাসেনা"। কাজেই বলা যেতে পারে আমাদের সকলেরই সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, অবসর বিনোদন সবেরই সঙ্গী ঐ last page.

কিন্তু বর্তমানে বিশেষ করে lock down থেকেই online ক্লাস এখন নার্সারি থেকে university student দের শিক্ষাগ্রহণের দোসর। তাই কাগুজে খাতার শেষের পাতা অবলুপ্তির পথেই ধরে নেওয়া যায়। এখন না হলেও হয়ত আগামী বছরে "শেষের পাতা" শুধু স্মৃতি হয়েই রয়ে যাবে।

মনোজ সরকার

নবমীর-দ্বৈরথ

থমথমে মুখে মাঠের একপ্রান্তে দ্রুত পায়চারি করেই চলছে বাসু। বারোটা বাজতে চললো নীলুটার এখনো দেখা নেই। এদিকে খেলা শুরু হব হব। জল শহরের ক্রিকেটপ্রেমী মাত্রই জানে নীলু deciding factor ! যদিও নীলু ছাড়াও দল যথেষ্ট শক্তিশালী। ক্রিকেটীয় দক্ষতায় সেই দলে সুযোগ যথেষ্ট কঠিন আমার পক্ষে। আর এটা তো সাধারণ কোনো খেলা নয় রীতিমতো প্রেস্টিজ ফাইট বলা যায়। যাই হোক নানান permutation-combination এর দলের এগারোতম স্থানে আমার নাম লেখা হতেই অবশেষে স্বস্তি। অন্ততঃ রাস্তা ঘাটে টিটকিরির হাত থেকে খানিক নিষ্কৃতি ! কিন্তু নীলু না আসা পর্যন্ত বাসু কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না। সেই নব্বই সাল থেকে আজ অবধি যত ম্যাচ হয়েছে, সময়ে অসময়ে কখনও দলে পরিবর্তন হয়েছে কখনও অধিনায়ক। কিন্তু মাঠের বাইরের Coach-cum-Manager এর দায়িত্বে অবধারিত ভাবেই বাসু। নব্বই এর দশকের শেষ দিকে জনৈক স্যাম পিত্রদার সৌজন্যে তখন জলশহরের মোড়ে মোড়ে তখন PCO বুথ।

– দিপু, যা সামনের বুথ থেকে নিলুর বাড়িতে একটা ফোন করে শোন ও কোথায় আছে ! বিরক্তি ঝরে পড়ছে বসুর গলায়। নীলু এতটা irresponsible হবে আশা করেনি সে !

বাসুর কথা শেষ না হতেই মোটরসাইকেলে নীলু মাঠে ঢুকলো। পেছনে ইন্দ্র। ইন্দ্র কে দেখে সকলে খানিকটা অবাক ! নবমীর দিন সুমনাকে ছেড়ে খেলা দেখতে ! দ্বৈরথের উত্তেজনার পারদের কাছে teenage প্রেমও কিনা পরাভূত ! বিমর্ষ ইন্দ্রকে দেখে সবার চোখে মুখেই খানিকটা প্রশ্ন চিহ্ন। জিজ্ঞাসাবাদে নীলু জানালো কদমতলার মোড়ে খানিকটা দেবদাস সুলভ আচরণে ভ্যাগবন্ডের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল ইন্দ্র। ওকে ধরে বেঁধে মাঠে নিয়ে আসতেই ওর যত দেরি !

পাঠক এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার এর পরবর্তী দেড়দশক ধরে দুর্গা পূজার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হতে চলা দ্বৈরথের সেটা সূচনা বর্ষ। প্রতিপক্ষে আমাদের ভাইরা। বয়সে বছর পাঁচেক ছোট ওরাও তখন কৈশোরের গন্ডি ছড়াচ্ছে। বিপক্ষ দলের অন্যতম দুই পান্ডা যেহেতু আমার আর মানুর দুই নিজের ভাই তাই অনুমান করতেই পারছেন উত্তেজনার পারদ বাড়ির রান্নাঘরে পর্যন্ত পৌঁছে যেত। কোন ছেলের দলকে মাঠে সমর্থন করবেন এই indecision এর মধ্যে পড়েই সম্ভবতঃ আমাদের বাবা'রা কোনোদিনও মাঠে আসেন নি। তবে দুইবাড়িতেই সমর্থনের দাঁড়িপাল্লা ছোট ছেলের দিকে সামান্য inclined ছিল সেটা খানিকটা টের পেতাম না বললে ভুল বলা হবে !

ইতিমধ্যে টস হেরে আমরা ফিল্ডিং নিতে প্রায় বাধ্য হলাম। কিন্তু কোথায় কি ! মাঠে নামার বদলে গোটা দল ইন্দ্রকে ঘিরে দাঁড়িয়ে, এমন একটা সদা প্রাঞ্জল যুবক কেন এমন দেবদাসে পরিণত হল তার উত্তর খোঁজায় ব্যস্ত। অনেক বাবা-শোনা করার পর যেটুকু জানা গেল –

বেশ কিছুদিন ধরেই ইন্দ্রর উপর সুমনা বিরক্ত। সুন্দরী এবং প্রায় সাত বছরের ছোট প্রেমিকাকে নিয়ে এমনিতেই ইন্দ্র যথেষ্ট চাপে থাকে, তার ওপর মহা-অষ্টমীর দিন আশ্রমে পৌঁছতে প্রায় একঘন্টা লেট হওয়ায় সুমনা খঁচে লাল; নিজ পক্ষ সমর্থনের সামান্যতম সুযোগও ইন্দ্রকে না দিয়ে সোজা বাড়ি। মান ভাঙানোর শত চেষ্টা বিফলে গেলে ইন্দ্র পণ করে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখে সুমনা কে impress করবে। কিন্তু হাত কেটে রক্ত বের করা তো দুরস্ত সূচ ফোটানোর কথা ভাবলেই যার জ্বর আসে সে কিনা রক্ত দিয়ে চিঠি লিখবে ? অগত্যা আর কোন উপায় ঠাহর করতে না পেরে রাত্রে শোবার সময় মশারির ভেতর কিছু মশাকে খানিকটা ইচ্ছা করেই ডেকে নেয় আরকি ! তারপর সেই মশা গুলোর তাজা রক্ত দিয়ে চিঠি লিখে আজ সকালেই পাঠিয়েছিল। সে সময়ে প্রেম মানেই চিঠি। আর

জল শহরের মেয়েরা নাকি বিয়ে করে শহরের বাইরে যায় না ! অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদ !! যায় হোক, কথা ছিল সকাল এগারোটা, কদমতলা মোড়। এপর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছিল, হঠাৎ সুমনার এক বান্ধবী কদমতলা ওর দিকে এগিয়ে আসতেই বুকটা ছ্যাঁত করে ওঠে। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই নাকি সন্ধ্যা হয় ! চিঠিতে রক্তের সাথে মশার অসংখ্য পা লেপ্টে থাকায়, সুমনার ঘটনাটা বুঝতে সময় লাগে নি। ব্যাস, আর কি। ইন্দ্র অবশ্য আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা দুর্বল চেষ্টা করেছিল; মশার পেটে তো ওরই রক্ত ছিল ! তাতে চিড়ে তো ভেজেইনি উল্টে বাকি চিঠি গুলোও ফেরত পাঠাবে হুমকি দিয়েছে সুমনা। মুহূর্তে, প্রবল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে গোটা দল; আর তাতেই প্রতিপক্ষ দল প্রায় কুতোপাত আর কি !

সে যাই হোক খেলা শুরু হতেই দুই পক্ষের প্রবল আগ্রাসনের মাঝখানে আম্পায়ারদ্বয় প্রায় পীঠটান দেন আর কি। ক্লাব বারান্দায় একমাত্র নিরপেক্ষ দর্শক প্রবীর কাকু তাড়িয়ে তাড়িয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতার স্বাদ নিচ্ছেন তখন ! প্রবীর কাকু আমাদের দলের অভির বাবা হলেও সবার সমান প্রিয়। সম্ভবতঃ বছর দুয়েক আগে অষ্টমীর রাতে 'রবি বোর্ডিং' কান্ড তাঁর মাথায় ছিল। তাই ছেলেরা আর কোনো প্ররোচনায় পা না দেয় সম্ভবতঃ সেদিকেই নজর রাখছিলেন।

ইতিমধ্যে খেলা প্রায় শেষের দিকে। মনা একটা বল কভারের উপর দিয়ে সীমানা পার করতেই উত্তেজনায় নাচতে শুরু করে দেবু। পাশে বসা দিপু সেকেন্ডের ভগ্নাংশে দেবুর হাফ প্যান্টটা নামিয়ে দিতেই মুহূর্তে গোটা মাঠ নিশ্চুপ, যেন পিন পড়লেও শোনা যাবে। ঘটনার আকস্মিকতায় দিপুও হতভম্ভ। দেবু যে হাফ-প্যান্টের নিচে ইজের খানা পড়েনি সেটা ও ভাবতেই পারেনি। ওই অবস্থায় দেবু প্যান্ট তোলার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে দিপুর বাপবপান্ত করতে করতে ওর পেছনে ছুটতে শুরু করতেই গোটা মাঠ মুহূর্তে ফাঁকা। প্রবীরকাকু কখন এলাকা ছেড়েছেন কেউ জানতে পারে নি। অবশ্য ততক্ষণে দিপু ভোকাট্টা !! অনেক কষ্টে চিলেড বিয়ারে গলা ভিজিয়ে দেবুকে ঠাণ্ডা করতে করতে নবমীর সন্ধ্যা শুরু।

পুনশ্চঃ ম্যাচটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই এর পর আমরাই জিতেছিলাম।

লুশিয়া বার্লিন

এঞ্জেলের লণ্ড্রী

(অনুবাদঃ দেব বন্দ্যোপাধ্যায়)

বছর খানেক হবে, কিছুটা অদ্ভুত ভাবেই দেখা হতো আমাদের। প্রায়ই। সব দিন যে একই সময়ে তেমনটা নয়। কোনদিন হয়তো বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমেছে। সোমবার। রাস্তার আলোগুলো অন্ধকারের মাপটা ঠিক বুঝতে না পেরে বেশ বিভ্রান্তির সাথে দপদপ করে জ্বলে উঠে আবার নিভে যাচ্ছে। কোনদিন আবার শীতের রোদ মাখতে মাখতে পূব দিকের দেওয়াল ঘড়িতে সাড়ে তিনটে। রাস্তাঘাটে শুক্রবার বিকেলের বাড়ি ফেরার হালকা ব্যাস্ততা। কিন্তু যখনই আমি এঞ্জলে পৌঁছাতাম, দেখতাম ঠিক বসে আছেন এক ভদ্রলোক। যেন অনেকক্ষণ এসেছেন, আর ফেরারও কোনো তারা নেই। বয়সের ক্লান্তির স্পষ্ট কিছু ছাপ মুখে চোখে নিয়ে বসে আছেন পুরনো বেতের চেয়ারটার বাম দিক ঘেঁষে। সাদা পাটের মতো চুল নেমে গেছে জীর্ণ এক মুখমণ্ডলের দুপাশ বেয়ে। স্থির, গভীর, লালচে দুচোখ। লম্বা চুলের শেষে দিকটা গোলাপি রাবার ব্যান্ড দিয়ে আটকানো দায়সারা বিনুনি । ফ্যাকাসে লেভি জিন্স ছাড়িয়ে দুটো সরু পা হাওয়াই চপ্পলের খয়ে যাওয়া অবশিষ্টে আটকে আছে। কোথাও যাবার তাড়া নেই ।

মিসেস আরমিতেজ এমনই বয়স্ক হলেও বেশ অন্যরকম ছিলেন। অনেক বছর আগেকার কথা। নিউইয়র্ক। ফীফটিন ষ্ট্রীটের সান -জুয়ান লণ্ড্রী। সেটা ছিল পোর্টোরিকানদের পাড়া। লণ্ড্রীর মেঝে জুড়ে সাবানের ফেনা। আমার মতো যারা সেখানে প্রায়ই আসতো তারা জানতো ঠিক কিভাবে পিচ্ছল মেঝে থেকে শুকনো শুকনো দ্বীপ খুঁজে নিয়ে দরজা থেকে লণ্ড্রী মেসিন, অথবা সেখান থেকে ড্রায়িং মেশিন পর্যন্ত পোঁছান যায় । আমার বাচ্ছারা তখন ছোটো ছোটো। প্রতি বৃহস্পতি বার সকালে যাই জামা কাপড় কাচতে সেখানে। উনি থাকতেন ফোর-সি, আমার ঠিক উপরের ভাড়াবাড়িতে। একদিন লণ্ড্রী শেষে ফেরার পথে আমার হাতটা টেনে আলিঙ্গনের ভঙ্গীতে একটা চাবি গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন,

"যদি পরের বার আর দেখা না হয়, আমাকে একটু খুঁজো আমার ঘরে, কেমন ?"

নিয়েছিলাম নিঃশব্দে। ক্ষণিক ওনার চশমা পেরিয়ে স্থির শুস্ক চোখে চোখ রাখতে রাখতে দৃষ্টি আবছা হয়ে আসছিলো। আর দেখা হয়নি। মিসেস আরমিতেজ চলে যান সোমবারে। বাড়ির সুপার ওনাকে মৃত অবস্থায় পায়। ঠিক কিভাবে সেটা জানা হয়নি আর। আমিও সান-জুয়ানে আর ফিরিনি কোনদিন।

মাসের পর মাস আমি আর সেই বয়স্ক রেড-ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক একটা বেতের চেয়ারের দুধারে বসে থাকি, অথচ কোনও দিন একটাও কথা বলা হয়নি। ঠিক যেন ট্রেন স্টেশনের অপেক্ষা। সময় অল্প, তাই আলাপ করে কি লাভ। একটু নড়ে চরে বসলে জীর্ণ চেয়ারের আলগা বুননে বেতে বেত ঘষে যাওয়ার আওয়াজে নৈঃশব্দ ভাঙতো। ওনার হাতে ঠোঙায় মোরা কিছু একটা পানিও থাকতো আর সব সময় আর চোখ লেগে থাকতো ঠিক আমার হাতে। সরাসরি নয়, আমাদের চেয়ারের উলটো দিকে একটা পুরনো আয়নায়। প্রথম প্রথম আমি কিছু ভাবতাম না। একটা বয়স্ক মানুষ ঝাপসা আয়না ওপার থেকে আমার হাতের দিকে চেয়ে আছে, তো কি হয়েছে ? দিনের পর দিন লোকটা এক দৃষ্টিতে আমার হাত দুটো লক্ষ্য করেন। লণ্ড্রীতে কাপড় দেওয়া থেকে, একের পর একটা জামা, তোয়ালে গোছানো, গুনে গুনে কয়েন বাছা, টেবিলে পরে থাকা কত বছরের পুরনো ম্যাগাজিনের পাতা ওলটানো, বা সিগারেটে আগুন ছোঁয়ানো, আমি যাই করি, লোকটা শুধু আমার হাতের দিকে চেয়ে থাকেন। তারপর এমন চলতে চলতে, আমার সন্দেহ হতে লাগলো। আমার হাতেই কি কিছু ? তারপর একদিন ধরা পরে গেলাম এই অস্বস্তিটুকুর কাছে। আমাদের দুজনেরই চোখ মিলে গেলো সেই পুরনো আবছা আয়নায়। আমি একটু ইতস্থত বোধ করে আয়নায় নিজের সাথে চোখ মিলিয়ে আমার হাতের দিকে তাকালাম। আমার হাতের ক্ষতের দাগ,

একাকিত্ব, কনুয়ের চারপাশ থেকে বাহুমুল পর্যন্ত বয়সের ঝুলন্ত বার্তা। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম আমার বাচ্ছাদের বেড়ে ওঠা, পুরুষের স্পর্শ, আর একটা ফুলে ভরা বাগান। আমার চোখ আয়নায় নেমে এলে খেয়াল করলাম লোকটার চোখেও অস্তিরতা, আর হাতদুটো গুতিয়ে হাঁটুর আড়ালে আটকে গেছে। অন্যদিনের মতো হাতের কাঁপুনিটা নেই। সব থেমে আছে টানটান ফ্যাকাসে শিরার শক্ত বাঁধুনিতে।

লণ্ড্রীর বাইরে মিসেস আরমিতেজের সাথে আমার বড় একটা কথা হত না। একবারই মনে আছে। সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। খুব ডাকাডাকি। বেরিয়ে এসে শুনি ওনার ফ্ল্যাটের টয়লেট থেকে জল উপছে পরেছে। শুধু তাই নয়; সেই উপছে পরা জল নিচে আমাদের ফ্লোরের ঝারবাতি জুড়ে ফিনকি দিয়ে ঝরছে। ঝরতে থাকা জল ফিলামেন্ট থেকে ছড়ানো আলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে পুরানো বাড়ির ধুলোয় মিশে দেওয়ালে রামধনু রং এঁকে দিচ্ছে মুহুর্মুহু। সেটা দেখতে দেখতে উনি আমার হাতটা শক্ত করে ধরে বলেছিলেন,

"সত্যি কি আশ্চর্য, না ?" সেই ঠাণ্ডা, মৃতপ্রায় হাতের স্পর্শটা আজও অনুভব করি ।

ভদ্রলোকের নাম টোনি। আপাচে রেড-ইন্ডিয়ান। মূলত উত্তর আমেরিকার উত্তরে পূর্বপুরুষদের বাস ছিল। একদিন আমি কাপড় গোছাচ্ছি, হঠাৎ পেছন থেকে আমার কাঁধে একটা হাতের স্পর্শ পেলাম। আমি জানতাম ওটা টোনি। ফিরে দেখি তিনটে খুচরো পয়সা হাতে, আমাকে দিতে চাইছেন। আমি প্রায় বলতে যাচ্ছিলাম "ধন্যবাদ"। তার পরেই খেয়াল করলাম, ওঁর হাতটা ভয়ঙ্কর কাঁপছে। পয়সাগুলো ড্রায়িং মেশিনে দেওয়া ওনার পক্ষে সম্ভব নয়। এমনিতেই মেশিনগুলোতে খুচরো ঢোকানো রীতিমতো কষ্টের ব্যাপার। প্রথমে একটা কাঁটাকে একছক্কর ঘুরিয়ে এক হাতে আটকে রাখা, আর অন্য হাতে নির্দিষ্ট খাঁজে পয়সা আটকে রেখে, একটা হাতল দিয়ে সজরে ঠেলতে হবে যাতে সেটা ভেতরে ঢুকে যায়। তারপর আবার কাঁটাটা যেখানে ছিল সেখানে ঘুরিয়ে পরের পয়সাটা ঢোকানোর জন্য তৈরি হতে হবে । এই ভাবে তিন তিন বার । যাইহোক আমি পয়সা গুলো নিয়ে পিছন ঘুরতেই দেখি টোনি নেই । প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে টোনি ফিরল। প্রায় টলতে টলতে। ওর জামাকাপড় গুলো প্রায় শুকিয়ে এসেছিল। আমারও গোছানো প্রায় শেষ। ড্রাইং মেশিনের দরজাটা খুলতে চেষ্টা করল। না পেরে মেশিনের লাগোয়া হলুদ প্লাস্টিকের স্টুলটায় বসেই যেন নিথর হয়ে গেলো। এঞ্জেল আর আমি ওকে ধরাধরি করে দুজন মিলে পাশের ইস্ত্রি-ঘরে নিয়ে এলাম। মেঝেতে শুইয়ে এঞ্জেল একটা ভেজানো মোজা নিয়ে মাথায় ঘাড়ে ছুঁতে ছুঁতে দরদী গলায় বিড়বিড় করতে থাকল,

"ভাই আমার, ফিরে এসো। ফিরে এসো। আমি জানি কি হচ্ছে তোমার ? এমন আমারও হয়েছে। কিচ্ছু হবে না । আর একটু, আর একটু। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কার মনের কি খবর কেই বা কততুকু জানতে পারে। টোনি চোখ খুলছিল না।

এঞ্জেলের লণ্ড্রী ছিল আলুকারকিতে। নেউমেক্সিকো। ফোথ স্ট্রীট। জরাজীর্ণ কয়েকটা দোকান পাশাপাশি। কাঁচের জানালার অপারে ধুলোপরা কিছু জিনিসপত্র, রঙচটা সাইনবোর্ড। বড় বড় হরফে হাতে লেখা ছাড়ের হাতছানি। উলটো দিকে একটা পরিত্যক্ত পারকিং লটে হাজার আবর্জনা জমা করা। অকেজো গাড়ির পার্টস থেকে বাতিল টয়লেট, কি নেই সেখানে। সেকেন্ডহ্যান্ড জামা কাপড়ের দোকানে সৈনিকদের পুরনো কোট, টুপি, জুতো আর একবাক্স জোরাহীন মোজা। ওই রাস্তা ধরে দুপা এগিয়েই কয়েকটা সস্তা মোটেল আর এঞ্জেলের লণ্ড্রী। সেখানে নানা রকম লোকের আনাগনা। সবাই যে বয়স্ক তেমনটা নয়। কমবয়সী চিকানা – ইন্ডিয়ান মেয়েগুলোকে দেখতাম। গোলাপি তোয়ালে, ছোট ছোট জামা কাপড়, নাইটি এসবের সাথে সাথে স্বামীদের নীল রঙের কোট কাচত ওরা। কোটের হাতায় বা বুকপকেটে ওদের নাম লেখা থাকতো। ড্রায়িং মেশিনের কাঁচে সেই নাম গুলো ক্ষণিক উঠে এলে,আমি পড়ে ফেলার চেষ্টা করতাম। টিনা, করকি, জুনিওর।

সর্বস্বান্ত, বাড়িঘর ছাড়া যাযাবর কিছু লোকও আঞ্জেলে আসতো। পুরনো তোশক, বালিশ, জং ধরা চেয়ার আরও যে কতো কি বাঁধা থাকতো ওদের ভাঙ্গাচোরা পুরনো বুইকের মাথায় । ওরা প্রায় সমস্ত

পরনে জামা কাপড় খুলে লণ্ড্রী করতে দিয়ে গাড়িতে বসেবসে সস্তা পানিও খেত। শেষ হলে কৌটোটা দুমরে মুষড়ে দিয়ে ফেলে দিতো পারকিং লটেই।

তবে এঞ্জেল আসলে রেড – ইন্ডিয়ানদের জায়গা। বেশির ভাগই পাবলো ইন্ডিয়ান। ওদের বাস সান-ফেলিপে, লাগুনা অথবা সান্দিয়া, এই সব জায়গায়। টোনিই একমাত্র আপাচে ইন্ডিয়ান যাকে আমি চিনতাম। আমি দেখতাম ইন্ডিয়ানদের প্রিয় সব রঙ। গোলাপী, জোরাল বেগুনি, কমলা, লাল সব জামা কাপড় ড্রায়িং মেশিনের আবছা, আদ্র কাঁচে ঘুরপাক খেতে খেতে নানা রঙ্গের বৃত্ত তৈরি করার চেষ্টা করছে। পারছেনা। আবার হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

আমি কি কারণে এখানে আসতাম, ঠিক গুছিয়ে ভাবিনি কখনো। বিশেষত, এটা আমার বাড়ি থেকে বেশ দূরে; শহরের একদম অন্য প্রান্তে। বাড়ির কাছেই ইউনিভার্সিটির সাজানো ক্যাম্পাস। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত লণ্ড্রী। মোজাইকের মেঝে যেখানে শেষ, সেখান থেকে উঠে গেছে পাথরের কারুকার্য করা দেওয়াল। নানান দেশের মানুষ সেখানে। ভেন্দিং মেশিন থেকে উঁকি মারতো কোকো-কোলা, জিরো-বার আরও কতকিই। মায়েরা বাচ্ছাদের বায়নায় সারা দিয়ে কিনে দিতো সেসব। সেখানে সুন্দর ভাবে হলুদ হরফে লেখা "আপনার রঙ, আপনার পরিচয়, আমরা বাঁচিয়ে রাখি"। রঙ বাঁচানোর সেই প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করে আমি একদিন একটা সবুজ বিছানার চাদর নিয়ে সারা শহর ঘুরে কেন জানিনা সেই এঞ্জেলেই পৌঁছালাম। চাদরটা কদিনেই বেগুনি না হলেও, একেবারে মেঠোসবুজ ফ্যাকাসে হয়ে গেছিলো। তবু আমার এঞ্জেল ভাল লাগতো আর ভালো লাগতো রেড-ইন্ডিয়ানদের রঙ্গিন লণ্ড্রী । আকেজো কোকের মেশিন, অকেজো টেলিফোন, স্যাঁতস্যাঁতে মেঝে সব আমাকে নিউ ইয়র্কের সান-জুয়ান মনে করিয়ে দিত। বার বার মনে আসতো একটা কথা,

"আমি কি বৃহস্পতি বার সান-জুয়ান থেকে ফেরার পথে মিস আরমেতাজকে খুঁজতে যেতাম ?"

টোনি কাগজে মোড়া জিন-বিমের বোতলে চুমুক দিয়ে আমার হাতের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে , অনেক কথা বলে যেতো অশারণে

"তোমাকে কি বলেছি যে আমি আপাচেদের নেতা ছিলাম ?"

বোলতো তবু ওর বউ অন্যদের ঘর পরিস্কার করতো। ওদের চার চারটে ছেলে ছিল। ছোটটা আত্মহত্যা করেছে খুব কম বয়সে। বড়জন ভিয়েতনাম গেছিলো। আর ফেরেনি। বাকি দুজনই স্কুল বাসের ড্রাইভার। আমি তেমন উৎসাহ না দেখালে হঠাৎ বলে উঠত,

"তোমাকে কেন পছন্দ করি, জানো ?"

আমি যদি বলতাম "না, কেন"?

আয়নায় আঙ্গুল দেখিয়ে বলে উঠতো টোনি "তোমার গায়ের রঙ এমন সুন্দর লাল বলে"

আমার গায়ের রঙ লালচে ঠিকই, তবে আমি সেভাবে রেড-ইন্ডিয়ানদের গায়ের রঙ নিয়ে ভাবিনি, আর সত্যি কথা বলতে কি আমি কখনো লাল-রঙ্গা ইন্ডিয়ানও দেখিনি। আমি কিছু না বললে টোনি আবার বলে চলতো,

"তোমার নামের উচ্চারণটা ইতালিতে কেমন হবে বলতো ? লু-চিই-আআ"

টোনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইতালিতে ছিল। ওর গলা ঝুলত বিশাল একটা নামের তাবিজ। খুব সম্ভত ইস্পাতের । একটা বিশ্বযুদ্ধীও ঝড় ওর ওপর দিয়ে গেছে সেটা খুব স্পষ্ট বোঝা যেতো। তাবিজটার একদিকটা তোবড়ানো দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম

"বুলেট ?"

টোনি কিছুটা অপ্রতাশিত ভাবে বলে ওঠে

"না না। দাঁত । বুলেটের ভয়েই কামরাতাম তো !"

আমরা দুজনেই হেঁসে উঠেছিলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে কথায় কথায় টোনি আবার বলেছিল,

"আজ বড্ড গরম, চলো আমরা আমার কাম্পারে গিয়ে বিশ্রাম করি,"

আমি দেওয়ালে সাঁটা ফ্যাকাসে সবজে রঙের সাইনবোর্ডগুলো দেখিয়ে বলেছিলাম "দয়া করে চলতি ওয়াশিংমেশিন ছেড়ে যাবেন না"

খুব হেঁসে উঠেছিলাম আমরা। আবার কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। শেষ না হওয়া কথা শুরু হল না আর। শুধু ওয়াশিং মেশিনের আবর্তে জল, কাপড়, সাবান, ফেনা মিশে ছপাৎ, ছপাৎ আওয়াজ। কেমন যেন নোনতা একটা বাতাস; ছন্দময় সমুদ্রের ঢেউ একে একে ছুঁয়ে দিচ্ছে আমাদের পা। টোনি আমার হাত ছুঁয়ে আছে।

হঠাৎ একটা ট্রেন চলে গেছে কখন অদূরে একটা রেল লাইন দিয়ে। টোনি আমাকে একটু ঝাঁকিয়ে বলল

"শুনলে ? ইস্পাতের দৈত্য ঘোড়া !"

আমরা আবার নতুন করে হেঁসে উঠলাম। আমার কিছু কিছু বদ্ধ ধারণা ছিল। যেমন সব আফ্রিকানরা চার্লি পার্কারের খুব ভক্ত হবেই, জার্মানরা খুব বাজে লোক, আর এই ইন্ডিয়ানদের খুব জঘন্য হাস্য রসিকতা। টোনির সাথে সময় কাটাতে কাটাতে সেই ধারনাটা কিছুটা দৃঢ়ই হোতো এক এক দিন। সময় কাটতে না চাইলে টোনি আমাকে বার বলে উঠত "একটা লোক জুতোর ফিতে বাধছিল নিচু হয়ে।" আরেক জন পেছনে এক লাথি মেরে বলল "তুমি সব সময় তোমার জুতো বাঁধছ কেন ?" বা একজন ওয়েটার এক ডিস খাবার পরিবেশন করতে এনে, কারুর গায়ে সব খাবার ফেলে দিয়ে বলল "যাঃ, আমি আবার ছড়ালাম ?" বলতে বলতে নিজেই হো হো করে হাঁসতে হাঁসতে চোখের জল মুছত ।

একদিন টোনি খুব টালমাটাল অবস্থায়। মানে পুরোপুরি মাতাল। পারকিং লটে কয়েকটা অকির (অক্লাহামার ইন্ডিয়ান) সাথে একটা ঝামেলা হয়েছে। ওরা ওর জিন বিমের বোতলটা কারতে চেয়েছিল। ও মার খেয়েও দেয়নি সেটা।

আমার লণ্ড্রী হয়ে গেছিল; কাপড়গুলোকে খুব সাবধানে ড্রায়িং মেশিনের দিকে যাচ্ছিলাম। টোনি সে পথে আমাকে পেয়ে বিরবির করতে করতে এসে আমার হাতে তিনটে কয়েন গুঁজে দিলো। আমি আমার আর টোনির জামা কাপড় মেসিনে দিতে গেলাম। টলতে টলতে চেয়ারে বসে টোনি খুব চেষ্টা করেও বোতলের ছিপিটা খুলতে পারছিলো না। আমি ফিরে এসে অন্য দিকটায় বসতেই টোনি চীৎকার করে উঠলো

"কেউ জানে না যে আমি আপাছের নেতা ! ভেবেছে কি ? আমার সাথে ইয়ার্কি ?"

ছিপিটার সাথে যুদ্ধ করতে করতে আবার জোরে চেঁচিয়ে উঠলো

"আঃ, হচ্ছেটা কি ?"

ওর চোখটা তখনো আয়নায়, আমার হাতের দিকে । কেন জানিনা বলে ফেললাম,

"আপাচেদের নেতা, তুমি লণ্ড্রী করতেও পারো না ?"

আমার হয়তো বলা উচিৎ হয়নি। টোনি একটা ফ্যাকাসে হেঁসে বলল

"তুমি কোথ থেকে এসেছ, লাল-চামড়ার মেয়ে?"

আমি একটা সিগারেট বার করে সেটার দিকে তাকাতে তাকাতে, টোনিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম

"আমার প্রথম সিগারেট এক রাজপুত্র ধরিয়ে দিয়েছিলো, বিশ্বাস করতে পারো ?"

টোনি কিছুটা তাচ্ছিলের ভাব নিয়ে বলল

"কেন বিশ্বাস করবোনা ? আগুন চাই?"

আমরা মৃদু হেঁসে চেয়ারে বসতেই, টোনি বাম দিকটায় ঠেস দিয়ে বেহুঁশ হয়ে গেলো। আর আমিও একা হয়ে গেলাম আয়নায়। আমাদের থেকে একটু দূরে একটা মেয়ে বসে ছিল। যেন একটা ঘন এক কুয়াশার ওধারে দেখতে পাচ্ছিলাম ওর অবয়ব একটা আদল। মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে এক সল্পদেহি শরীর চেয়ারের সাথে মিশে আছে। যেন কোনও আলাদা অস্তিত্ব নেই। পাতলা কোচকানো চুলের ওধারে মুখ, চোখ দেখা যাচ্ছিল না পরিস্কার। লণ্ড্রী মেশিনের অন্তহীন আবর্তন ওকে আগলে রেখেছিল, তবু ফাঁক দিয়ে যেন এক তরুন মায়ের সদ্যজাতকে হারানোর কান্না শুনতে পেলাম। আবার নিঃশব্দ; একটু পরে মেয়েটা জামা কাপড় একটা আকাশী রঙের ঝুড়িতে গুছিয়ে সেই নিশব্দের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেলো। আমি আর টোনি একা তখন লণ্ড্রীতে। আমি আমার আর টোনির জামা কাপড়ের শুকলো কিনা দেখে

ফিরে এসে আবার বসলাম। আয়নায় চোখ পড়লো আমার হাতের দিকে, তারপর চিবুক, ঠোঁট হয়ে দেখতে দেখতে আমার নিলাভ চোখের সৌন্দর্যে আটকে গেলাম। দেখতে পেলাম চিলির সমুদ্রতট, ভিনা দেল মার। জাহাজের আলো গুলো একে একে জ্বলে উটছে শেষ রোদের পাহারায়। আমি একটা ধার করা সিগারেট হাতে ঘুরছিলাম। এক সুপুরুষ যুবককে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে দেখে এগিয়ে গেলাম। একটা আগুন চাইলাম। প্রিন্স এলি খান এক গাল মিষ্টি হাসি হেঁসে বললেন "শুভসন্ধ্যা"। আসলে ওঁর কাছে লাইটার ছিলোনা ।

ততক্ষণে এঞ্জেলের লণ্ড্রীতে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। সমস্ত মেসিন থেমে গেছে। রাস্তার আলো গুলো নিশ্চিত ভাবে জ্বলে আছে। ওদের আলো এসে টেবিলে রাখা পুরনো ম্যাগাজিন গুলোতে পড়েছে। আমি আমার জামাকাপড় গুছিয়ে বসেছিলাম। এঞ্জেল ফিরে এলে, বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। এরপরও অনেকদিন এঞ্জেলে এসেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারিনা কখন ওই বয়স্ক রেড-ইন্ডিয়ানকে শেষ দেখেছিলাম ।

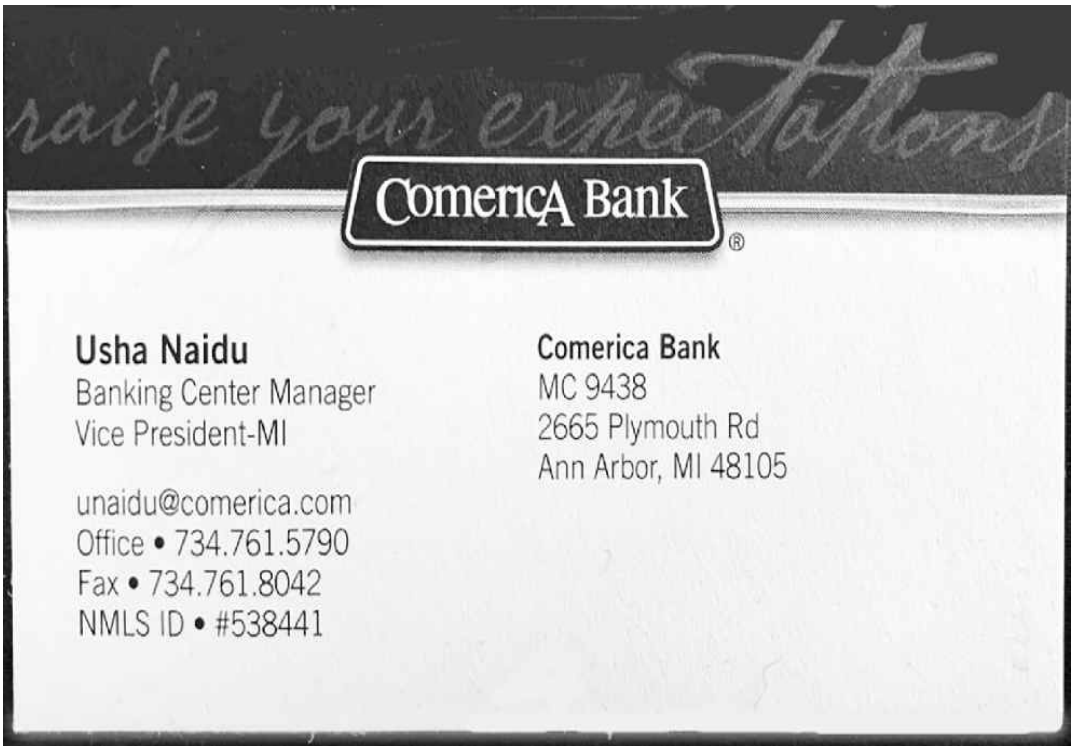

You can say :

Please contact
Usha Naidu for any banking needs and
she also specializes in small business loans.

Old National proudly supports Swajan of Great Lakes.

Strengthening the fabric of our community.

As much as we are a financial institution, Old National is a group of parents, volunteers, artists, athletes, neighbors and friends. By making investments of our time, talent and treasure, we work with you to strengthen the fabric of our community.

Member FDIC | oldnational.com

OLD NATIONAL BANK
Your bank. For life.™

Ann Arbor 2723 S. State Street 734.887.2600

EQUAL HOUSING LENDER

2019 WORLD'S MOST ETHICAL COMPANIES® WWW.ETHISPHERE.COM

Sai Grocers
Your Indian Grocery Store
35576 Grand River Ave.
Farmington Hills, MI 48335
Tel: 248 - 536 - 2676
Fax: 248 -987 - 2813
Best Wishes to Swajan On Occasion of Durga Puja

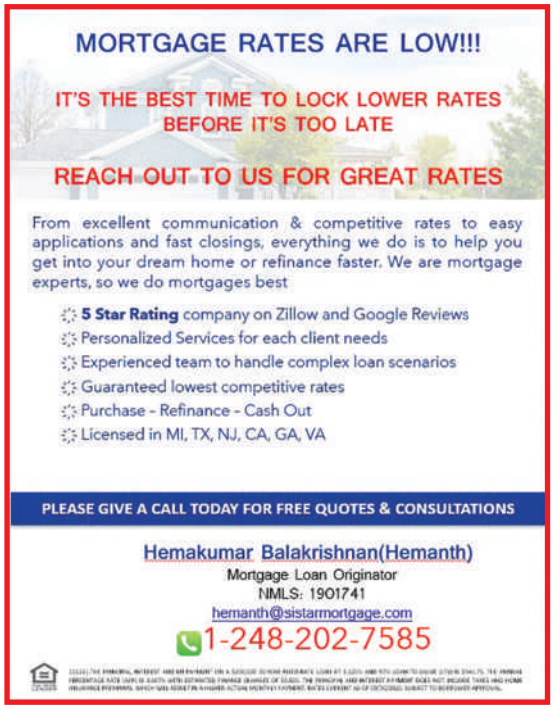
MORTGAGE RATES ARE LOW!!!
IT'S THE BEST TIME TO LOCK LOWER RATES BEFORE IT'S TOO LATE
REACH OUT TO US FOR GREAT RATES
From excellent communication & competitive rates to easy applications and fast closings, everything we do is to help you get into your dream home or refinance faster. We are mortgage experts, so we do mortgages best
5 Star Rating company on Zillow and Google Reviews
Personalized Services for each client needs
Experienced team to handle complex loan scenarios
Guaranteed lowest competitive rates
Purchase - Refinance - Cash Out
Licensed in MI, TX, NJ, CA, GA, VA
PLEASE GIVE A CALL TODAY FOR FREE QUOTES & CONSULTATIONS
Hemakumar Balakrishnan(Hemanth)
Mortgage Loan Originator
NMLS: 1901741
hemanth@sistarmortgage.com
1-248-202-7585

daawath
INDIAN CUISINE BAR & BANQUET
EXPERIENCE THE INDIAN FEAST
OUR MENU IS CONSISTENT WITH INDIAN TASTES
WE OFFER A COMFORTABLE AND INVITING AMBIENCE AND ATMOSPHERE
WE SERVE SOUPS, APPETIZERS TO TRADITIONAL INDIAN ENTREES,
BREADS AND AROMATIC HYDERABADI DUM BIRYANIS,
WIDE RANGE OF TANDOOR, CHINESE TO DELICIOUS DESSERTS AND BEVERAGES
We do wide range of Caterings
Happy hour everyday
25750 NOVI RD, NOVI, MI 48375 | (248)380-6808
www.daawathmi.com

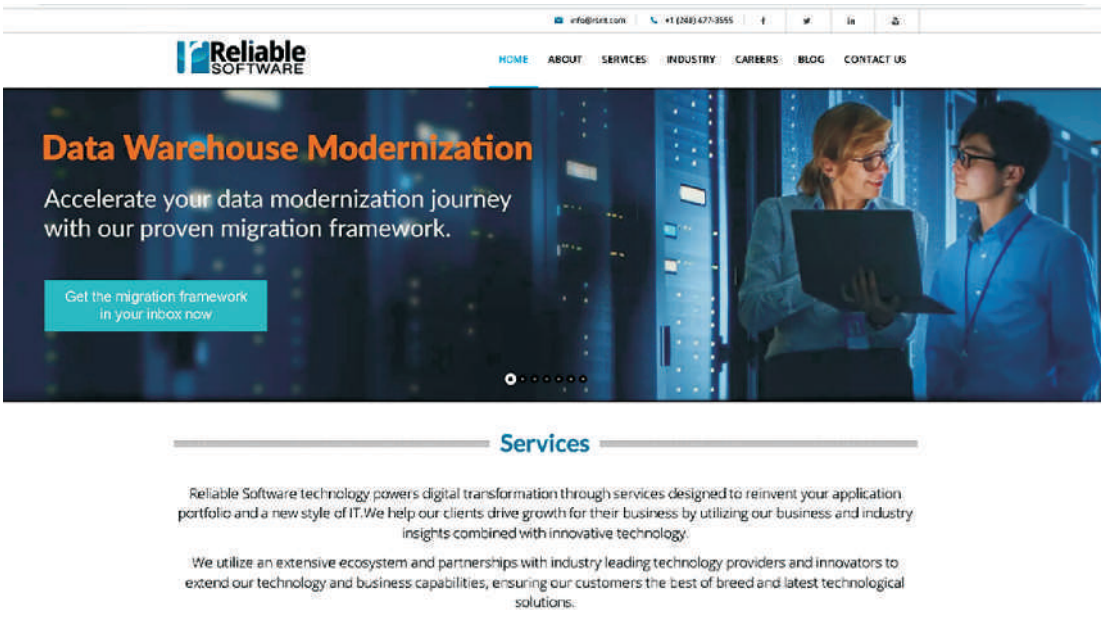
Reliable SOFTWARE
HOME
ABOUT
SERVICES
INDUSTRY
CAREERS
BLOG
CONTACT US
Data Warehouse Modernization
Accelerate your data modernization journey with our proven migration framework.
Get the migration framework in your inbox now
Services
Reliable Software technology powers digital transformation through services designed to reinvent your application portfolio and a new style of IT.We help our clients drive growth for their business by utilizing our business and industry insights combined with innovative technology.
We utilize an extensive ecosystem and partnerships with industry leading technology providers and innovators to extend our technology and business capabilities, ensuring our customers the best of breed and latest technological solutions.

WE OFFER A BROAD RANGE OF SERVICES FOR INDIVIDUALS AND BUSINESS OWNERS:
WE ARE EXPERIENCED, PROFESSIONAL AND FRIENDLY.
NOHAD AJROUCHE ,MBA
(313)570-3110
ANIL SAKHUJA, MBA, CPA, CGMA
(313)617-3596
• ACCOUNTING/BOOKKEEPING
• PAYROLL
• SALES/USE TAX/IFTA
• INDIVIDUAL TAXES
• BUSINESS TAXES
• NON-PROFIT TAXES, ETC.
• FRANCHISE ,GAS STATIONS
• ACCOUNTING AND TAXES
• WE SPECIALIZE IN LOGISTICS (TRUCKING,
OUR RATES ARE AFFORDABLE WE ARE A PART OF YOUR COMMUNITY
PLEASE CONTACT US FOR A FREE INITIAL CONSULTATION

SUNRISE
DEPOS

Sunrise Depos
Granite, Quartz & Marble

Kuntal Biswas
Cell: (248) 916-7098
info@sunrisedepos.com
www.sunrisedepos.com
23347 Winnsborough, Novi MI 48375

Marimba Auto

HOME ABOUT US WHY MARIMBA? PRODUCTS CONTACT US

Welcome to Marimba Auto

Marimba Auto LLC is a global supplier and manufacturer of automotive products and components. We specialize in providing global product solutions to our customers, by managing all aspects of the engineering, quality and delivery.

Our Products

STEERING SEATING SUSPENSION TRANSMISSION ENGINE

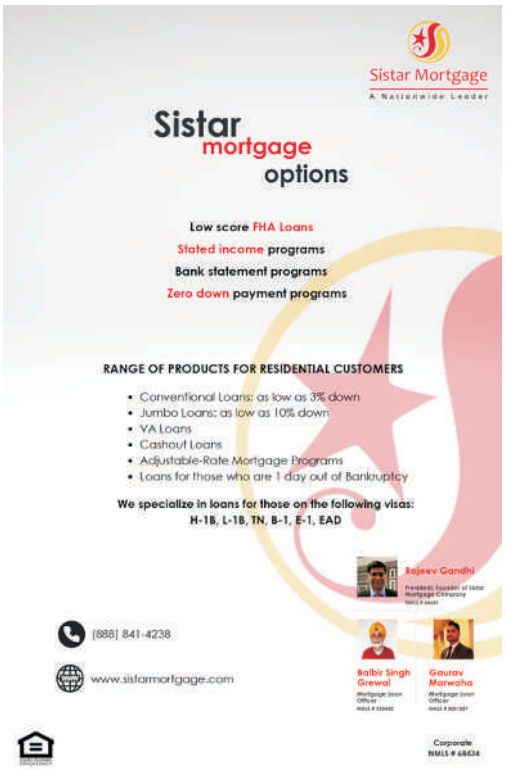
Sistar Mortgage
A Nationwide Leader
Sistar
mortgage
options
Low score FHA Loans
Stated income programs
Bank statement programs
Zero down payment programs
RANGE OF PRODUCTS FOR RESIDENTIAL CUSTOMERS
• Conventional Loans: as low as 3% down
• Jumbo Loans: as low as 10% down
• VA Loans
• Cashout Loans
• Adjustable-Rate Mortgage Programs
• Loans for those who are 1 day out of Bankruptcy
We specialize in loans for those on the following visas:
H-1B, L-1B, TN, B-1, E-1, EAD
Rajeev Gandhi
(888) 841-4238
www.sistarmortgage.com
Balbir Singh Grewal
Gaurav Marwaha
Corporate

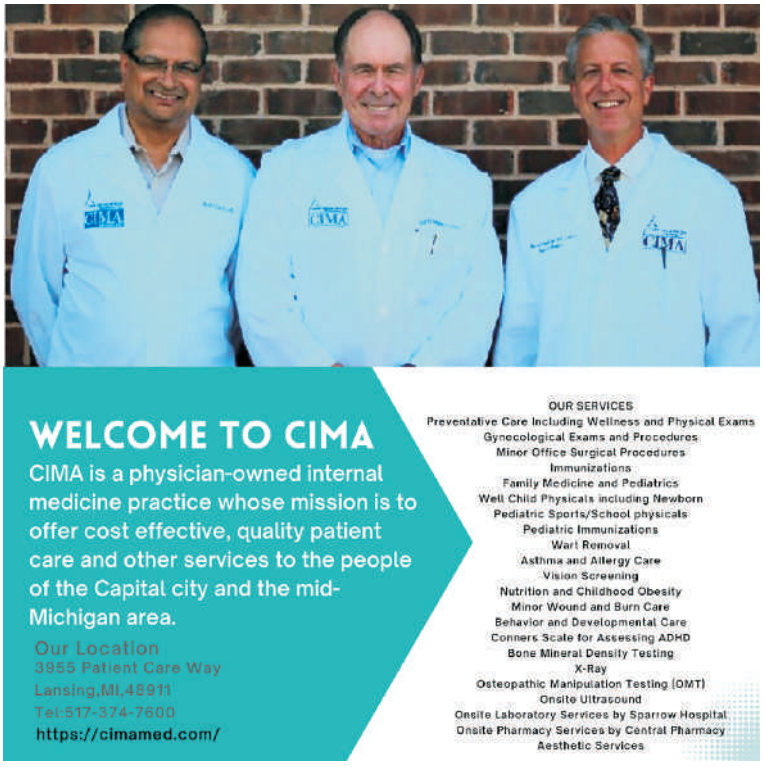
WELCOME TO CIMA
CIMA is a physician-owned internal medicine practice whose mission is to offer cost effective, quality patient care and other services to the people of the Capital city and the mid-Michigan area.
Our Location
3955 Patient Care Way
Lansing,MI,48911
Tel:517-374-7600
https://cimamed.com/
OUR SERVICES
Preventative Care Including Wellness and Physical Exams
Gynecological Exams and Procedures
Minor Office Surgical Procedures
Immunizations
Family Medicine and Pediatrics
Well Child Physicals including Newborn
Pediatric Sports/School physicals
Pediatric Immunizations
Wart Removal
Asthma and Allergy Care
Vision Screening
Nutrition and Childhood Obesity
Minor Wound and Burn Care
Behavior and Developmental Care
Conners Scale for Assessing ADHD
Bone Mineral Density Testing
X-Ray
Osteopathic Manipulation Testing (OMT)
Onsite Ultrasound
Onsite Laboratory Services by Sparrow Hospital
Onsite Pharmacy Services by Central Pharmacy
Aesthetic Services

Dakshesh Patel and Family

Wish you a very happy

Durga Puja 2022

Samyuktha Madishetty, Md

Board Certified in Internal Medicine
Now welcoming New Patients
Accepting most Insurances
Can Communicate in Telugu and Hindi
Affiliated to all Oakwood Hospitals

http://www.oakwood.org/Samyuktha-Madishetty-MD
24100 Oxford Street, Dearborn, MI 48124
Phone : 313-561-3000/3001

C4D MORTGAGE

Special Thanks

ক্রিস্টিনা রিভিয়েরা গার্জা

সাধারণ সুখ । নির্ভেজাল সুখ । প্যারিস রিভিউ । গ্রীষ্ম ২০১৮

অনুবাদঃ দেব বন্দ্যোপাধ্যায়

অদ্ভুত ব্যাপার। কোথাও কিচ্ছু নেই, মেয়েটার হঠাৎ সব মনে পড়বে। একদৃষ্টিতে নিজের তর্জনীতে জড়িয়ে থাকা পান্নার আংটিটার দিকে দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে । তারপর সেই অন্য আংটিটা চোখের সামনে ভাসবে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে নিজের অজান্তে বলে উঠবে "সত্যি, কি অসম্ভব সুন্দর !" আংটিতে নিখুঁত খোদাই করা সাপের ফনা, ঢেউ খেলানো শরীরের সূক্ষ্ম কারুকার্যে আঙ্গুল বোলাবে। হালকা আদরের ছোঁয়া। তার নিচে নিথর হয়ে থাকবে হাত। স্বচ্ছ শ্বেত পাথরের মতো। মখমলি কোনো দ্বীপান্তরে।

ট্যাক্সির পেছনের সীটের এক কোনে ভ্যানিটি ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে বসে ছিল মেয়েটা। সেই কাকভোরে শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছোটা। বুকের মধ্যে অনিদ্রা আর অনিশ্চয়তা মেশানো একটা অস্বস্তি। এয়ারপোর্টে পৌঁছালেই অপেক্ষা করছে আরো অনেক লম্বা একটা পথ। এই অনুভূতিটাই যেন অস্বস্তিটা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। এটা প্রতিবার হয়। মনে নেই ঠিক কবে শুরু হয়েছে । কোথাও যাবার আগে ঘুমের মধ্যে নানান দুঃস্বপ্ন নামে। প্লেনের সিঁড়িতে পা রাখতে রাখতে মনে হয়, ভয়ঙ্কর সব দুঃসংবাদগুলো যেন অপেক্ষা করে আছে; কেউ এখনো বলেনি। কারো একটা অন্তিম দশা, প্রিয় কোনো মানুষের মৃত্যু সংবাদ অথবা হয়তো অন্তহীন নিঃস্বঙ্গতা ।

এসব ভাবতে ভাবতে বিড়বিড় করে প্রতিজ্ঞা করে ফেললো সে "এই বারই শেষ, আর না"

নিজের কথায় নিজেরই মাথা নাড়তে কেমন অবাক লাগছিলো।

ট্যাক্সি ড্রাইভারটা বলে উঠলো "কিছু বলছিলেন ?"

আয়নাটায় চোখে চোখ পড়তে একটু সামলে মেয়েটা বলল "না না ... কিছু না, ভাবছিলাম এই যাওয়াই শেষ বার"।

কোনো উত্তর ফিরে আসার আগেই জোরে একটা ব্রেক। গাড়ির গতি কমে এলো। সামনে বোধহয় খুব লম্বা জ্যাম।

ড্রাইভার যেন নিজেকেই বলল "এক্সিডেন্ট মনে হচ্ছে।"

আস্তে আস্তে জায়গাটায় পৌঁছিয়ে কিছুই চোখে পড়লো না তেমন। কোনো দুমড়ানো মোচড়ানো গাড়ি তো নেই, ছড়ানো ছেটানো গাড়ির কোনও অংশও দেখা গেলো না। উৎসুক চোখে দুজনেরই জানলায় মুখ। ফ্যাকাসে আকাশ, অন্য গাড়িতে আধঘুমন্ত যাত্রী, হাইওয়ের পাশের নিখুঁত ভাবে কাটা ঘাস। এই সব দেখতে দেখতে চোখ বুজে আসছিলো।

জটটা একটু হালকা হয়ে এলে হঠাৎ ড্রাইভারের চীৎকার "আরে, একটা বডি না ? জামা কাপড়ও নেই যে"।

মেয়েটার স্থির গলায় সম্মতি "মাথাটাও নেই দেখছি, চট করে কি একবার থামা যায় ?"

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশগুলোকে ইডেন্টিটি কার্ড দেখালো। হলুদ ফিতের ঘেরাটোপ পেরিয়ে মুণ্ডুহীন নিথর শরীরটার চারপাশে বারকয়েক ঘুরল। তারপর কি একটা দেখে থেমে গেলো। মাটিতে জমাট বাঁধা রক্ত। ঠিক পাশে বাম হাতের তর্জনীতে পান্নার একটা আংটি। কেমন যেন বেমানান ভাবে পরিষ্কার। অক্ষত। দুটো জড়িয়ে থাকা সবুজ রঙের সাপ। খুব সূক্ষ কাজ । মেয়েটা হাত বাড়িয়ে ছুঁতে গেলো। কিন্তু পৌছানো গেলো না। মনে হল অনেক দূর। অন্য কোনো পৃথিবীতে। অথবা মানচিত্রে আঁকা কোনো দ্বীপ। ছুঁয়েও ছোঁয়া যায় না। শূন্যে পাথর হয়ে যাওয়া নিজের হাতটা অনুভব করছিলো সে।

এই যে শুনছেন, আর কতক্ষণ ? এবার যে দেরি হয়ে যাবে' ট্যাক্সির ইঞ্জিনটা গর্জে উঠলো ।

মাথার ভেতর একটা শহর

শহরে ফিরে আসার পর অনেককেই জিজ্ঞেস করেছে মেয়েটা। কেউ কিচ্ছু জানে না। পুলিশের কাছেও কোনও খবর নেই।

অফিসে কদিনের ছোকরা, সেও সন্দেহের চোখে "আর ইউ সিওর ?" আড়চোখে একবার তাকিয়ে আবার বললো

"আমাদের চোখে তো পড়লো না কিছু ?"

"খবর কাগজেও বেরোয় নি, না ?" মেয়েটা বললো ।

"ও, খবরের কাগজেও নেই ?" ছেলেটা মাথা নাড়তে নাড়তে চোখ সরিয়ে নিলো। আর সহ্য হচ্ছিলো না। কাউকে কিছু না বলে অফিসে থেকে বেরিয়ে গেলো ।

কেবল ট্যাক্সি ড্রাইভারটারই সব কিছু মনে ছিল। পকেটের কাপড় উল্টে খুচরো উজাড় করার মতো যা কিছু মনে ছিল সব খালি করে দিলো গড়গড় করে। তার মনে ছিল এয়ারপোর্ট যাওয়ার পথে দেহটা পড়ে ছিল হাইওয়ের দ্বিতীয় লেনে। তিন চার জন পুলিশ সেটা ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। জামা কাপড় ছিল না, অ্যাবস্ট্রাক্ট আঁকার মতো গায়ের নানান জায়গায় ছড়ানো ছিটানো ক্ষত। তার মনে ছিল চাপ চাপ রক্ত। অস্বাভাবিকভাবে মোচড়ান হাত পা। বিকৃত। নিচু হয়ে দেহটা পর্যবেক্ষণ করে উঠতে গিয়ে মেয়েটার হাঁটু ফোটার শব্দও সে নাকি পেয়েছিলো ।

আংটিটা মহিলার হাতে বেশ লাগছিল। অথচ যেন তার সেটার প্রতি বিশেষ কোনও টান নেই ।

"আমার এই ধরণের আংটি খুব পছন্দ" অগত্যা মেয়েটাই প্রথম কথাটা পাড়ল।

মহিলা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে নিজের হাতটা তুলে চোখ বরাবর এনে দেখলো আংটিটা। যেন প্রথম বার দেখছে।

"তোমার সত্যি এটা পছন্দ ?"

"হ্যাঁ, পারলে কোনোদিন এরকম একটা আংটি পরবো" মেয়েটা বলে উঠলো নির্দ্বিধায়।

মহিলা মুখ ঘুরিয়ে আলো ঝলমলে সুইমিং পুলের জলে চোখ ডুবিয়ে এক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে গেলো।

তারপর একটা অপরিষ্কার কষ্ট মাখানো গলায় "এটা সুদূর প্রাচ্যদেশের, প্রাচ্যদেশ জানো ? প্রাচ্যের এক দ্বীপপুঞ্জে এর জন্ম"।

কথাগুলো একটু কাব্যিক শোনাচ্ছিল। বলতে বলতে এই সুইমিং পুলের ধার, এই পার্টি, জমায়েত মানুষের মোলায়েম এই গুঞ্জন থেকে সে অনেক দূরে কোথাও চলে গেছে যেন।

"গিফট ছিল এটা" আবার হাতটা শূন্যে তুলে আংটিটা দেখে "একটা খুব সেন্টিমেন্টাল ডেট"। তার নিখুঁত পরিপাটি নখ গুলো তখন তারাভরা আকাশের দিকে। সেগুলোর মাঝে উজ্জ্বল পান্নার আংটিতে চোখ আটকে মেয়েটার গলায় একটু দুষ্টু সুর "ও, লাভার'স গিফট তাহলে।"

মহিলা ঠোঁটে নরম একটা হাসি "বলতে পারো।"

তারপর একটু থেমে হাসিটা নিভিয়ে আবার বললো "সেরকমই কিছু একটা।"

আবার সেই পুরনো প্রশ্ন গুলো মেয়েটার মাথায় ঘুরছে। যারই সাথে নতুন আলাপ হয়, এমনটা হয়। গোয়েন্দাগিরির এই মুশকিল। অকুপেশনাল হ্যাজার্ড বলা যায়। "এই মানুষটা কি কাউকে খুন করতে পারে ? এ খুনি না আসলে নিজেই একজন ভিক্টিম ?"

সুইমিং পুলের ধার থেকে চোখ ফেরাতে ফেরাতে মনে হলো মহিলাকে দূরের কোনো একটা অবসন্ন মুহূর্তকে পেছনে ফেলে আসতে হচ্ছে। অবসন্ন হলেও প্রাণবন্ত, গাঢ়। মেয়েটা ঠিক বুঝতে পারছে না। এই মহিলা কি পারবে একজন কে ঠান্ডা মাথায় খুন করে তারপর গলা কেটে হাইওয়েতে ফেলে দিতে ? মহিলা কি প্রাচ্যের কোনো চক্রের ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছে ? ওর মুখে এই উদাসীন ভাবটা আসলে মুখোশ না মুখোশ খোলা মুখ ? আসলে এখানে এসেই সব কিছু থেমে যাচ্ছে। মহিলাকে দেখে, কথা বলে তার সম্বন্ধে কোনো একটা পরিষ্কার ধারণা করা যাচ্ছে না। পুরোটাই অন্ধকার ।

"একটা আংটি আসলে কি ?" হাতটা স্টিয়ারিং হুইল রেখে মেয়েটার প্রশ্ন।

তার সহকারী গোয়েন্দা ছেলেটা কিছু বলার আগেই আবার প্রশ্ন "আসলে কি একটা হাতকড়া ? কোনো দলে যুক্ত থাকার চিহ্ন ?"

"আরে, কোনো প্রতিশ্রুতি বা প্রমিস-টমিস ও হতে পারে তো ?" বলে উঠলো ছেলেটা "রোমান্টিক একটা গিফটের মধ্যে ওতো ষড়যন্ত্র নাও তো থাকতে পারে ?"

মেয়েটা মুখে একটা বিরক্তি পোষার আওয়াজ করে বললো "এই একটা সিগারেট দে তো ?"

"সে কি ? তুমি তো খাওনা" ছেলেটা কিছুটা অবাক।

"আরে না রে বাবা ... আঙুলের ফাঁকে ধরবো।"

"নাও, আর ইউ সিওর ... এটা সেই আংটিটাই ? একই ডিজাইন ?"

"ডিজাইন, ইয়েস। অদ্ভুত কোনো কোইন্সিডেন্স হতে পারে ঠিকই ... যাক বাদ দে ... আমাদের আরো অনেক কাজ আছে। বেনামি লোকের খুনের কিনারা করে ফেললেও কেউ একটা টাকাও দেবে না ..."

দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে পরস্পরের চোখের কোনে কি একটা খুঁজতে গিয়ে হো হো করে হাসি। সদ্য বৃষ্টি হয়ে গেছে। ট্রাফিক লাইটের লাল আলোয় রাস্তাটা ধুয়ে যাচ্ছে। জানলার কাচ নামিয়ে তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ওদের মধ্যে কেউ একটা বলে উঠলো,

"কোথায় শুরু করি বলতো ?"

মাথার ভেতর চলচ্চিত্র।

আবার দেখা হয়ে গেলো ওদের। এবার হোলসেল ক্লাবে। প্রতিদিনের ব্যবহারের জিনিস, শাক সবজি, হাতে লেখা দামের ট্যাগ, এই সব। মেয়েটা কফির ফিল্টার খুঁজছিলো। হঠাৎ চোখে পড়লো পান্নার আংটি পরা সেই মহিলা, খুব যত্ন করে ওয়াইন বোতলের লেবেল গুলোতে কিছু অনুসন্ধান করছে। মেয়েটা একটু দূর থেকে খেয়াল করছিলো তার সরু কাঁধের ওপর ছড়িয়ে থাকা লম্বা চুল, হাই হিলের জুতো। খুব সুন্দরী না হলেও সহজে চোখও ফেরান যায়, তাও নয়।

"এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার হল তো ?" মেয়েটা একটু কাছে এসে বলল।

মনে হলো মহিলা তেমন অবাক হয়নি "এখানে প্রায়ই আসো নাকি ?" আলতো আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে। সেই মৃদু হাসি।

"একেবারেই না" মেয়েটা বলে চলল "যদি না জানি যে আট নম্বর আইলে বেলা তিনটের সময় পান্নার আংটি পরা কারোর সাথে দেখা হয়ে যাবে।"

"তুমি এখনো এটা চাও ?" আবার হাতটা শূন্যে তুলে নিখুঁত নখগুলোর নিচে আংটিটা দেখলো।

"আপনি বিক্রি করবেন ?"

শুনে মহিলা খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। তারপর মেয়েটার কাঁধে হাত রেখে বললো "এসো আমার সাথে এসো।"

ওরা একটা গাড়িতে চেপে ইঞ্জিন স্টার্ট করলো। মহিলা কাকে একটা ফোন করে এক অচেনা ভাষায় একটু চাপা গলায় কিসব বলতে থাকলো। সরু রাস্তার দুপাশে খাবারের দোকান, ফুটপাথে হরেক জিনিসের বিক্রি, ভাজা চর্বির গন্ধ। সেই গন্ধ আস্তে আস্তে তীব্র আর আরও জটিল হচ্ছে। হাজারো মানুষের পোড়া গন্ধ হয়তো। শেষে গাড়ি থামলে জায়গাটায় নেমে মেয়েটার মনে হলো যেন সে নিজের অজান্তে অল্প সময়ে বেশ কিছু দেশ, বেশ কিছু সময়রেখা পার করে এসেছে।

ফোনে কথা শেষ করে মহিলা বলে উঠলো "আমি তোমার কাছে একটা ফেভার চাইবো কিন্তু। আমার জন্য তুমি একটা কেস ইনভেস্টিগেট করতে পারবে ?"

গাড়ি থেকে বেরোতেই কালো রোদচশমার নিচে তার চোখগুলো একেবারেই দেখা যাচ্ছিলো না। তবে ঠোঁটের হালকা একটা কাঁপুনি ছিল নিশ্চিত "তুমি তো ডিটেক্টিভ ? এটাই তো তোমার কাজ, তাই না ?"

মেয়েটা সম্মতির ঘাড় নাড়তেই, আবার কাঁধে হাত "এসো"।

আবার সরু গলি, চাঁদোয়া টাঙানো দোকানপাট, প্রচুর মানুষের চলাফেরা। সেসব পাশ কাটিয়ে ওরা পৌছালো কোথাও একটা। মহিলা একটা লাল কাঠের

দরজা খুললো। ভেতরে দুটো চামড়ার নরম সোফাতে বসতে বসতে মনে হলো অনেক পথ পেরিয়ে অবশেষে একটা নিরিবিলি কোথাও পৌঁছানো গেছে। একটা রোগা বেঁটে লোক ওদের জল দিলো। পেছনে হালকা একটা মিউসিক চলছে। কি হতে চলেছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একটু আঁচ করতে মেয়েটা একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো

"আমাদের দেখা হওয়াটা তাহলে খুব কাকতালীয় কিছু ছিল না। তাই না ?"

মহিলা একটু বিরক্তির সুরে উত্তর দিলো "আমার রিকুয়েস্টটা কি খুবই অস্বাভাবিক ?"

"আপনি আমাকে ওই হাইওয়ের বডিটার ব্যাপারে কিছু বলবেন ? আর ওই অন্য আংটিটার ব্যাপারেও ?"

জলের গ্লাসটায় চুমুক দেবার অছিলায় গ্লাসে মুখ ঢেকে মেয়েটা চারপাশে চোখ বোলালো। ঘরটার জানলাগুলো ভারী ভারী ভেলভেটের পর্দা টাঙ্গানো। নরম কাঠের মেঝেটার কোনে মাকড়সার জাল। সেখানেই যেন সব কিছু শেষ হয়েছে। আর সব কিছুর শেষে আসলে হয়তো কিছুই নেই।

"তুমি কি বরাবর এতটাই ব্ল্যান্ট ?" মহিলার গলায় আবার বিরক্তি। চোখ বোজা।

"তাই হবে হয়তো। এটাই আমার কাজ, তাই না ?"

জলের গ্লাসে আর একবার চুমুক দিয়ে "দ্যাটস হাউ আই মেক মাই লিভিং"

"আমি তোমার যা ফী, তার থেকে তিনগুণ বেশি টাকা দিতে পারি" মহিলা বলল।

"মেক ইট ফোর" প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটা উত্তর দিলো। ওদের কথা শুরু হলো।

তার কাছে টাকাপয়সা খুব কাজের জিনিস ... টাকাপয়সা আর খবর। যেন বিনিময় করা যায় এমন দুটো মুদ্রা। সব বিনিময়ের শেষে আয়নায় নিজেকে দেখে তার হাঁসি পায়। "এটা কি সত্যি দরকার ছিল তার ?" জল। বিন্দু বিন্দু জল ওর মুখে। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সে বলবে "না । সেভাবে ভাবলে তার সত্যি কোনও দরকার ছিল না"। অথবা দরকার হয়তো ছিল। কিন্তু তার দাম মেটাতে গিয়ে যাকে নিঃস্ব হতে হয়েছে, সেটা আসলে সে নিজেই। তারপর সে আবার হাত টা শূন্যে তুলে আংটিটা দেখবে, যেন এই প্রথমবার দেখছে। একটা হাতকড়া, একটা ফাঁদ, একটা মাথাহীন মৃতদেহের জীবনের সাথে তার শেষ যোগসূত্র। একটা চিহ্ন। প্রকৃতির সাথে যোগাযোগ। বিছানায় শরীর ঢাকতে ঢাকতে তার মনে হবে চাদরটা রেশমের হলে হয়তো কিছুটা আরাম হোতো।

মহিলা মেয়েটাকে বলে "ওটা আসলে একটা প্রতিশ্রুতির চিহ্ন, এ প্রমিস। প্রতিশ্রুতি বিনিময়ের চিহ্ন। একটা চুক্তি।"

মেয়েটা থামিয়ে বললো "রক্ত চুক্তি ? মানে ব্লাড প্যাক্ট?" বিদ্রূপটা চেনা যাচ্ছিলো ।

মহিলা চোখে চোখ রেখেই বললো "কিছুটা সেরকমই।"

মহিলা জানায় সেও সেদিন সকালে এয়ারপোর্টের পথে ছিল। গাড়ি আস্তে হয়ে যায়। রাস্তায় পড়ে থাকা মৃতদেহের কথা সেও শুনেছিলো তখন। ড্রাইভারই কিসব বলছিল। সে এ ব্যাপারে বেশি মাথা ঘামায় নি। তাড়া ছিল। সামনে ছিল বহুদূরের পথ। সুদূর পূর্বের। তার সঙ্গী আসেনি। মহিলা মেয়েটাকে অব্যবহৃত টিকিটদুটো দেখিয়ে বলেছিলো সেদিন অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর সমস্ত আশা ছেড়ে ফিরে এসেছিলো সে। একটু কাঁদতেও পারেনি।

মহিলা জানায় সে এ বিষয়ে কিছু জানতে চায়নি প্রথমে। পরে রাস্তা ঘাটে, কখনো ট্যাক্সি ড্রাইভারদের মুখে বডি, মাথা, হাইওয়ে, এয়ারপোর্ট কানাঘুষো কিছু কথা শুনে এব্যাপারে জানতে ইচ্ছে হয়। না চেয়েও প্রতিধ্বনি আর বাতাসের ফিসফিসানিতে ধীরে ধীরে মাথায় ধাঁধার জট খুলে যেতে থাকে। ধাঁধার প্রায় সবটা মিলে গেলেও বাকি রয়ে যায় শুধু একটা মাথা। সেখানেই রয়ে গেছে একটা শহর, একটা সিনেমা, পুরো একটা জীবন। সেই মাথাতেই।

পান্নার আংটিটা আসলে খুবই দামী ছিল। ইন্টারনেটে এক নামি রত্ন ব্যবসায়ীর ওয়েবসাইটে ঠিক

এরকমই একটা আংটির ছবি খুঁজে পেয়েছিলো মেয়েটা। সেটাই যদি হয় তাহলে মহামূল্যবান। আংটিটা এসেছিলো সুদূর এশিয়া থেকে। আংটিতে জড়িয়ে থাকা পান্নার সাপ দুটো অতি প্রাচীন। কেউ জানেনা ঠিক কতটা। একটু দূর থেকে জড়ানো সাপের আলিঙ্গন শৈলীটা প্রেমঘন মনে হলেও আসলে সেটা জিঘাংসারই স্পষ্ট দৃশ্য। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। সাপদুটোর মুখোমুখি, খোলা চোয়াল, শক্ত । নিস্তব্ধ একটা অসাড়তা অথবা কোনো বিপদের পূর্বাভাস। আংটিটার মাপ যেন এমন ভাবে ঠিক করা হয়েছে যে ওদের তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো কাছে এসেও স্পর্শ করতে পারেনি। এক দুর্ঘটনা থেকে ওদের বাঁচিয়ে রেখেছে কেউ। কোনো এক জাদুমন্ত্রে।

একটার ওপরে আরেকটা সাপ। ওদের শরীর দুটো মিশে আছে। মুখ খোলা। ওদের নিচে গোলাকার আংটির ভিত। কোনো সিনেমার শুরু অথবা কোনো শহরের। টিপটিপে বৃষ্টি। জানলার কাঁচের পেছনে থেকে মেয়েটা সব দেখতে পাচ্ছিলো। থেকে থেকে ট্রাফিক রঙিন লাইট গুলো জ্বলছে আর নিভছে। তার আলো ধুয়ে দিচ্ছে এক নারী আর এক পুরুষের শরীর। সব কিছুর থেকে অনেক দূরে ওরা শুয়ে আছে, এক অজানায়। ওদের শরীরে নিটোল বক্রতা। খোলা ঠোঁট। উষ্ণ চায়ের জল। জুঁই ফুলের গন্ধ। একজনের নিঃশ্বাস আরেক জনকে ছুঁয়ে আছে। ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু শব্দ: চিরদিনের। মখমলি দ্বীপ। এই খানের সবকিছু আমার। একজনের শরীরের নিঃশাস বেয়ে আসছে অন্যের শরীর দিয়ে।

মাদক পাচার চক্রের তদন্তে অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা নাম উঠে এসেছিলো। বেশি সময় ছিল না। জিজ্ঞাসাবাদ করতে মেয়েটাকে দূরের এক শহরে যেতে হয়েছিল। যখন কথা হচ্ছিলো কার যাওয়া উচিত, একজন সদ্যবিবাহিত আর এক নতুন ছোকরা গোয়েন্দা দুজনেই তারদিকে আঙ্গুল বাড়িয়েছিল। সবচেয়ে স্বাভাবিক পছন্দ। দূরে কোথাও যাবার চিন্তায় যে অস্বস্তিটা আসে, তার সাথে মাথায় মাথাহীন দেহটার ছবি। এসব সঙ্গী করে প্লেনে উঠতে হয়েছিল। সিটবেল্ট বাঁধতে বাঁধতে ভাবছিলো আস্তে আস্তে ওর এই সঙ্গীহীন জীবনে কি কি জিনিস প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে। যেমন দূরের কোনো শহরে যাওয়া, একটা সদ্যমৃত দেহের পাশে দাঁড়ানো, একটা হারিয়ে যাওয়া মাথার খোঁজ ।

"ট্রাভেলিং পর প্লেজার ?" পাশের যাত্রী আলাপ করতে চাইছিলো।

মাথা নেড়ে চোখ বুজেছিলো ও। মনে পড়ছিলো না শেষ কবে নিজের জন্য কিছু করেছে। খুব সাধারণ কিছু। খুব নির্ভেজাল কিছু।

মাথার ভেতর উড়ন্ত উড়োজাহাজ।

"উপর থেকে চাপ আসছে, তদন্ত বন্ধ করতে হবে" গাড়িতে চাপতে চাপতে চাপা গলায় বললো ওর ছোকরা সহকারী।

কিছুক্ষণ পর রেস্টুরেন্টে বসে আবার একই কথা। কথাটা মেয়েটার কানে যায়নি বলে মনে হয়ে ছিল বোধহয়।

অনুরোধের সুরে আরো বলে চললো "কোনো ক্লু নেই তো, আর অমনি কত মরছে।"

চ্যাটচ্যাটে আঙ্গুল। তাড়াতাড়ি কথাগুলো বলতে বলতে মুরগির একটা হাড় ওর মুখ থেকে বেড়িয়ে একটু একটু নড়ছিলো।

"আর দেখো, মাথা টাও তো কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।"

মাথার ভেতর একটা শরীর। শ্বেতস্ফটিক হাত। একটা আংটি ।

দরজা খুলে বাড়ি ঢুকলো মেয়েটা। জুতো খুলে সাজিয়ে রাখলো। চায়ের জল চাপিয়ে গা এলিয়ে বসলো সোফাতে। শরীরে ক্লান্তি আর কেমন যেন কষ্ট মাখা একটা মন। কারোর কিছু আসে যায় না। অনেক অনেক গুলোর মধ্যে হারানো একটা মানুষ। একটা অঙ্ক। পরিসংখ্যান মাত্র। তার মন খারাপ করে আসে দূরের কোনো এক শহরের জন্য। সময়ের আঘাতে ক্ষয়ে যাওয়া মানুষের মূর্তি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এক মহিলা টাকা দিয়ে একটা মাথা কিনতে চাইছে, যে মাথার ভেতর একটা শহর, সে শহরে অনেক আলো জ্বলে, সেখানে জড়িয়ে থাকা দুটো শরীর, তাদের নিঃশ্বাসে শত্রুতা আর একটা

উড়োজাহাজ উড়তে চাইছে। মন খারাপ নিয়ে আসে এই দরজা খোলা, জুতো খোলা, চায়ের জল বসানো, এই বাড়ি যেখানে একটা মাথা ভেসে উঠে আর একটা মাথার ভেতর। মেয়েটা ঘটনাস্থলে ফিরে গেলো। ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করিয়ে হাইওয়ে ধারে ধারে নিখুঁত চাঁটা ঘাসে কি যেন খুঁজতে লাগলো। চমৎকার ঝকঝকে আকাশ। ফুরফুরে হাওয়া। আকাশের দিকে তাকিয়ে একবুক নিঃশ্বাস নিলো। একটু অবাক লাগছিলো। এক মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস হচ্ছিলোনা যে এয়ারপোর্টগামী হাইওয়েতে একা একটা মেয়ে, অজানা কারুর হারিয়ে যাওয়া একটা মাথা খুঁজছে। নুড়ি পাথর। অপরিচ্ছন্ন হাঁটাপথ। খড়কুটো, ছেঁড়া কাপড়, সিগারেটের টুকরো, পাস্টিক, জং-ধরা ক্যান। কিছু কিছু জিনিস খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো। কিছু জিনিস দূর থেকে। বোঝা যাচ্ছিল যে আসলে খুনটা অন্য কোথাও করা হয়েছিল। এখানে নয়। অনেক দূরে কোথাও। হয়তো সুদূর প্রাচ্যে।

কি এমন করলে এরকম হয়। কি করলে একজন মানুষ তার মাথাটাই হারাতে পারে। মাথার হারালে তার সাথে ভেতরের সব কিছুও তো হারায় : একটা শহর, একটা সিনেমা, একটা জীবন, একটা আংটি। লোকটা যা যা হারিয়েছে, এখন সেগুলো যেন মেয়েটার হয়ে উঠেছে: শহরের আলো গুলোর মধ্যে যে যোগাযোগ, সিনেমার পেছনে যে আলো, জীবনের ভেতরের আলো, আংটির ভেতরের আলো। সমস্ত ঔজ্জ্বল্য যেন বাঁধা আছে একটা গোলাকার ভিতে। মেয়েটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলো সব, মুহূর্তে চোখ ধাঁদিয়ে গেলো। হয়তো একটা স্বপ্ন, অথবা নিশ্চই হালুসিনেশন: আবার দুটো জড়ানো শরীর। উদরের মসৃণতায় মন্থর গতিতে একটা তর্জনীর দ্বিধাহীন চলাচল; আর বাকিসব আঙ্গুল, করতালু আগলে আছে নাভীমুল। লম্বা রেশমি চুলে শক্ত পুরুষালি হাত। লাগাম। লাগাম ছাড়া তৃপ্তির গোঙানি। সাধারণ সুখ। নির্ভেজাল সুখ। অনেকবার মনে হয়েছে এসবের কি দরকার ছিল ? এই থেমে যাওয়া নিঃশ্বাস, নিথর চোখ, হাড়ভাঙার মড়মড় শব্দ। লোকটাকে সাথে পরিচয় ছিল না। তবে জানতে ইচ্ছে তার, হয় এতো বড়ো ঝুঁকি কি সে আবার নিতে পারতো ?

মাথার ভেতর সাধারণ সুখ, নির্ভেজাল সুখ ।

মহিলা যে খুব সুন্দরী তেমনটা নয়, তবু চোখ টানে। ওর চারপাশে ছড়ান থাকে অজানা আবরণ। সেটাই আকর্ষণীয়। একটা যেন দ্যুতি। তার হাঁটা, অনিচ্ছা মেশানো ভঙ্গিতে হাতটা শূন্যে তুলে দ্যাখানো। ওই আংটিটা। ওই প্রতিশ্রুতি। সব কিছু রুচিশীল, পরিশীলিত।

মেয়েটা খবরটা দিতে এসেছিলো। আসলে দুঃসংবাদই বলা চলে। কিছুই বিশেষ জোগাড় করতে পারেনি সে। মহিলা যে মানুষটার নাম এতদিন মুখেও আনেনি, সে হারিয়ে গেছে কোনো অজানায়। কোথাও তার চিহ্ন মাত্র নেই। সে অনেক খুঁজেছে, পুরোনো খবরের কাগজ, নানান দস্তাবেজ, গলি, খানাখন্দ, রাস্তায়। যে খুন অনেক দূরে কোথাও হয়েছে তার জন্য ছোটাছুটি করে বেড়ানো সম্ভব নয়। আর সহ্য হচ্ছে না এসব।

"আমি আপনার এই তদন্ত আর টানতে পারছি না।" এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললো সে "হয়তো কেউই পারবে না।"

মহিলা হাসলো কিনা ঠিক বোঝা গেলো না। একটা নরম গদির চেয়ারে বসতে বললো। "একটু আইস টি ?"

তারপর একটা দরজা খুলে দিলো। ছোটোখাটো চেহারার বয়স্ক মহিলা বেরিয়ে এলো। মেয়েটির সামনে নতজানু হয়ে বসল সে। স্থির দৃষ্টিতে আস্তে আস্তে তার জুতো দুটো খুলে সরিয়ে রাখলো। তারপর মাথা নিচু করে আবার কোথায় চলে গেলো। একটু পরেই একটা ভেলভেট মোড়া ছোট চৌকি আর একটা গামলায় আধউষ্ণ জল নিয়ে এলো। হালকা ধোঁয়া ধোঁয়া জলে নানান সুগন্ধি জড়িবুটি, আর শুকনো ফুল ভাসছিলো। চোখ নিচু রেখেই সন্তর্পনে মেয়েটার নগ্ন দুটো পা সেখানে ডুবিয়ে দিলো । খুব সাধারণ অথচ গভীর একটা তৃপ্তি। তারপর সে মেয়েটার একটা পা নিজের দু পায়ের মাঝে রাখা চৌকিতে তুলে রাখলো। ধীরে ধীরে পায়ের পাতা, আঙ্গুল, গাঁঠ, গোড়ালি খুব যত্ন করে মালিশ করছিলো। পান্নার আংটি পড়া মহিলা চুপ করে ছিল। সে চুপ করেই থাকলো। কখনো শক্ত, কখনো মোলায়েম করে মালিশ

চললো। আরামে কিছুটা ঘুম আসছিলো। কখন খেয়াল নেই হাঁটুটা একটু বেঁকিয়ে টেনে জোরে মোচড় দিলো মহিলা। প্রচণ্ড যন্ত্রণা। জোরে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করলো। ব্যথায় চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছিলো। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলো সে।

ঠিক সেই সময়, মহিলা শূন্যে হাত বাড়িয়ে মুখের কাছে মেয়েটার পারিশ্রমিকের টাকাটা এগিয়ে দিলো।

"গুড ওয়ার্ক" বলে অভিনন্দনও জানালো।

মাথা নিচু করে টাকাটা নিতে নিতে মেয়েটা এক দৃষ্টিতে মহিলার দিকে চেয়ে থাকলো। ওর কনুই টা হাঁটুর ওপর ভাঁজ করা। হাতে টাকা। পায়ের পাতা ডোবানো জল তখনও কুসুম কুসুম গরম। একটা অদ্ভুত ছবি। একটা অন্যরকমের ছবি। ইন্দ্রিয়ের কেমন একটা অস্বাবাভিক বিকৃতি।

আমি বহুদিন ঐরকম একটা আংটি পরতে চাইতাম। এখনও চাই।

মুনমুন ব্যানার্জী

দামোদরের সঙ্গে মুণ্ডেশ্বরী-ফাউ মুণ্ডেশ্বরীর সঙ্গে মোলাকাৎ

দামোদরের বাঁধে উঠতে গিয়ে তো ছোটু মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে গড়গড়িয়ে নীচে নেমে আসছে, সুমি বোধহয় ভাবছিল দরজা খুলে লাফ মারবে কিনা .....

কিন্তু আমি বেশ নিশ্চিন্ত। পেছনে তো জনপ্রাণী নেই, নামুক গে যাক। শুধু স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে রাস্তা বরাবর নামলাম। আবার স্টার্ট দিয়ে গাড়ী বাঁধে তুল্লাম। মোটর ভেহিকেলের কোনো অফিসার দেখলে নির্ঘাৎ 'লাইছেন ক্যানছাল' হতো।

লাল মাটির রাস্তা, খানাখন্দ কিছু আছে তবে খুব সরু নয়। কিন্তু ছোটু ছাড়া কোনো চারচাকা নেই, বিক্ষিপ্ত বাইকের আনাগোনা আর এক দুটো ট্রাক্টর দেখলাম রাস্তায়। আমাদের চারচাকা গড়িয়ে গড়িয়ে 'সোনার গড়িয়া' নামে এক জায়গায় এলো। এবার গুগল জানাচ্ছে 'বেগোর মুখ' যেতে গেলে বাঁদিকে আরও দু কিলোমিটার যেতে হবে। এতক্ষণ রাস্তার দুধারে কোনো বাড়িঘর দোকানপাটের অস্তিত্ব ছিল না, দুদিকেই ঢালু জমি নীচে নেমে গেছে কিন্তু এখানে কয়েকটা দোকান দেখলাম। এইরকম জায়গায় গুগলকে চক্ষু মুদে বিশ্বাস করা যায় না, সুমি নেমে একটা দোকানে জিজ্ঞাসা করে এলো গাড়ি নিয়ে বেগোর মুখ অবদি যাওয়া যাবে কি না, দোকানি আশ্বস্ত করলেন ও বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন যে এই রাস্তা ফেরিঘাটে পড়বে, তারপর ফেরি নৌকো ধরে ওপারে যেতে হবে। পরে বুঝেছিলাম ভদ্রলোকের অল্টো কে-টেন গাড়ি আর তার ড্রাইভারের ওপর অগাধ আস্থা। যদিও মাটির রাস্তা তবুও শুরুতে রাস্তা মোটামুটি ঠিক ছিল, কিন্তু যত এগোচ্ছি ততই ক্রমশঃ সরু হতে লাগলো আর বাঁধের ওপর বলে দুপাশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে, একটু

এদিক ওদিক হলে ..... (এ রাস্তায় বাইক আর হেঁটে মানুষ চলাচল করে এটা আদৌ গাড়ি নিয়ে যাবার রাস্তাই নয়।) একে মাটির রাস্তা তায় বর্ষাকাল, খানাখন্দও ভালোই। খুব মন দিয়ে চালাচ্ছি, দুর্গা নাম জপারও সুযোগ পাচ্ছিনা। দুধারের ডালপালা মাঝে মাঝেই ছোটুর গায়ে ঢলে পড়ছে। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি এ রাস্তায় গাড়ি নিয়ে আসা উচিৎ হয় নি কিন্তু 'ফিরিবার পথ নাহি' শুধু ভাবছি ফেরি ঘাটে পৌঁছে নিশ্চয়ই ব্যাক করাবার মতো জায়গা পাবো। অবশেষে ফেরি ঘাটে পৌঁছলাম। একটা ছোট্ট ঘর আছে আর সামনে এক টুকরো জায়গা, যেখানে ছোটুকে কোনো মতে ব্যাক করানো যাবে। দেখে ধড়ে প্রাণ সঞ্চার হলো। ফেরি ঘাটের মানুষ গুলো খুব অবাক চোখে আমাদের নিরীক্ষণ করছিলেন সেটা আমাদের গাড়োলপনার জন্যে কিনা জানিনা। বর্ষায় বাঁশের সাঁকো ভেসে গেছে তাই এখন ফেরি নৌকোই ভরসা। তবে এখানে দামোদরের ভয়াল রূপ নেই, কেমন যেন স্তিমিত, ক্ষীণকায়। মোটর লাগানো ছোটো নৌকো সারাদিন পারাপার করে। হরদমই বাইক আর সাইকেল তাতে চেপে এপার ওপার করছে। বেগোরমুখ যেতে গেলে ওপারে গিয়ে আধ কিলোমিটার হেঁটে পৌঁছতে হবে। ছোটুকে ব্যাক করিয়ে রেখে নীচে নেমে এলাম ফেরি ধরতে, পাঁচ টাকা ভাড়া। ওপারে গিয়ে দামোদরের পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলাম। 'কোনো দিকে জনমানব নাই', শুধু আমরা দুজন। এক জায়গায় দেখলাম ভাঙা হাঁড়ি, কাপড় চোপড়, পোড়াকাঠ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে, বুঝলাম এটা শ্মশান। শ্মশান ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে দেখি দু তিনটে নৌকো বাঁধা রয়েছে কিন্তু দাঁড়ি, মাঝি কেউ নেই। নৌকাবিহারের ইচ্ছে ছিল, কাছে পিঠে কেউ নেই যে জিগ্গেস করবো। দূরে এক মহিলা তার গরু নিয়ে যেতে এসেছিল, ও দিদি ! ও দিদি ! বলে তপতপে মাটির ওপর দিয়ে থপথপিয়ে গিয়ে তাকে মাঝিদের খবর জিজ্ঞেস করলাম। তিনি হতাশ করে বললেন, এ তো বালির নৌকো, বর্ষায় তো বালি তোলা হয় না। এখন সব ধান রুইতে মাঠে গেছে, এখন কাউকে পাবেন না। কি আর করি, দুঃখিত হৃদয়ে নদীর দিকে এগিয়ে চললাম।

প্রকৃত পক্ষে মুণ্ডেশ্বরী দামোদরের শাখানদী, তার উৎপত্তিস্থল এই বেগোর মুখ। এখানে মুণ্ডেশ্বরীর বিস্তার

দামোদরের চেয়ে বেশী, দুটি জলধারার রং ভিন্ন, দামোদর গৈরিক বসন আর মুণ্ডেশ্বরীর সবজে রঙের শাড়ি। ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে নেমে অনেকটা পথ চলে এখানে এসে দামোদর নিজেকে বিভক্ত করে ফেলেছে। ডানদিকে বয়ে যাওয়া নিজের শাখা মুণ্ডেশ্বরীকে সিংহভাগ জলরাশি দান করে ক্ষীণকায় দেহে হুগলি নদীতে (গাদিয়ারা, হাওড়া) নিজের মাত্রা শেষ করেছে। মুণ্ডেশ্বরীও হাওড়ার বাকসিতে রূপনারায়ণের বুকে নিজেকে সঁপে দিয়েছে।

জল দেখলেই ছুঁতে ইচ্ছে করে আমার, ভিজে বালির ওপর পদচিহ্ন এঁকে নদীতে পা ডোবালাম। সঙ্গে জামাকাপড় থাকলে দিব্যি স্নান করা যেত, কোথাও কেউ নেই, ফাঁকা ধু ধু চারদিক। আমরা দাঁড়িয়ে আছি মুণ্ডেশ্বরীর পাড়ে, অবিভক্ত দামোদরের বিশাল বিস্তার দেখতে পাচ্ছি সামনে। যে দামোদর পেরিয়ে এদিকে এলাম সে ভীষণ সরু যেন বৃদ্ধ, রোগাভোগা চেহারা। তবে মুণ্ডেশ্বরী চওড়া হলেও গভীরতা তেমন নেই, জায়গায় জায়গায় চড়া পড়ে ঘাসবন গজিয়েছে।

মন ভরে নদীর জোলো বাতাস গায়ে মাখলাম, চোখ ভরে আকাশ নদী সবুজ প্রকৃতি দেখলাম, এবার প্রত্যাবর্তন। ফেরার সময় মাত্র আমরা দুজনই ফেরির যাত্রী। এবার আগেই দুর্গা নাম জপ করে ছোটুকে স্টার্ট দিলাম, সোনার গড়িয়ায় পৌঁছে হাঁফ ছাড়লাম। এবার কোথা যাই? গুগলদাদা বল্লো, পনেরো কিলোমিটার দূরে দামোদরের ওপর 'কানারিয়া' ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে গেলে দেউলপাড়া বৌদ্ধ মন্দির দর্শন করা যাবে। বাঁধের ওপরের রাস্তা দিয়ে আবার চল্লাম এবার দামোদর আমাদের ডানদিকে। কখনোও কাছে এগিয়ে আসে কখনোও সরে যায়। যখন সরে যায় তখন নীচে কচি ধানক্ষেতের সবুজ মখমলের গালচে দেখা যায়। যেতে যেতে এক জায়গায় আপনিই দাঁড়িয়ে গেলাম। রাস্তার একেবারে পাশেই গাছের ফাঁক দিয়ে দেখছি দামোদর বয়ে যাচ্ছে, ওপারে ফেরিঘাটের বাঁশের সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে, দু চারজন যাত্রী অপেক্ষমান। কয়েক জন দ্বিপ্রাহরিক স্নান সারছেন, কয়েকটি বাচ্চা জলে ঝাঁপাই জুড়েছে, বড্ড ভালো লাগছিলো দেখতে। ওখানেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চা আর টা দিয়ে পেটপুজো হলো।

এবার চল্লাম কানারিয়া ব্রিজ, এদিকের রাস্তা ক্রমশঃ ভালো হচ্ছে, বাঁধের রাস্তা শেষ হয়ে চাঁপাডাঙা রোড দিয়ে কানারিয়া ব্রিজ এলাম, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিরাট ব্রিজ। ভর দুপুর বেলা ব্রিজটা একদম সুনসান, কোনো গাড়ি বা লোকজন নেই। ছোটু কে দাঁড় করিয়ে কয়েকটা ছবিও তুল্লাম। ব্রিজের ওপর থেকেই বৌদ্ধ মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মন্দিরে পৌঁছে 'হা হতোস্মি', দরজা তালা মারা, নোটিশ বোর্ডে লেখা, পাঁচটায় মন্দির খুলবে। এখন সবে আড়াইটে। তবে এই ভর দুপুরে কোন্ মন্দিরের দরজাই বা খোলা থাকে, ভগবান বলে কি একটু দিবানিদ্রার আরাম পেতে নেই ?! কিন্তু এই আড়াই ঘণ্টা রাস্তার ধারে অপেক্ষা করাও অসম্ভব। কাজেই বুদ্ধ দর্শনের আশা ত্যাগ করলাম। তবে বাইরে থেকে মন্দিরের অবস্থা দেখে মনে হলো রক্ষণাবেক্ষণের হাল খুব খারাপ। রং চটা, জায়গায় জায়গায় শ্যাওলা ধরা, মন্দিরের পাঁচিল ঘেঁসেই দুপাশে বাড়িঘর, মনে হলো ঘরবাড়িগুলো যেন পারলে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে যাবে।

বুদ্ধদেবকে 'বাই বাই' বলে চাঁপাডাঙা চল্লাম। চাঁপাডাঙায় মাসীর বাড়ি, হঠাৎ করে আমাদের দেখে মাসী ভীষণ খুশী। চা এবং ভালো মতো টা সেবন করে মাসীর ভালোবাসা মাখানো আমের আর তেঁতুলের আচারের কৌটো নিয়ে সোওওওওজা বাড়ি।

Tanima Basu

Where the Sky Meets the Earth

While visiting the Monument Valley, the 17-mile loop road which just reopened during the pandemic, we experienced the vastness of the nature with our eyes. This place is called Navajo Nation's Monument Valley Navajo Tribal Park. Monument Valley (Navajo: Tsé Bii' Ndzisgaii, meaning valley of the rocks) is located on the Arizona and Utah state line of the United States of America. Navajo Nation is one of the largest native American reservations in the US. We have witnessed one of the most majestic places on earth. This great valley boasts sandstone masterpieces that tower at heights of 400 to 1,000 feet, framed by scenic clouds casting shadows that graciously roam the desert floor. The angle of the sun accents these graceful formations, providing scenery that is simply spellbinding. The red soil always attracts me and reminds me to my homeland. I grew up in the state of West Bengal in India. My hometown is in the district of Purulia. We have red earths. This laterite is both a soil and a rock which is rich in iron and aluminum.

The landscapes of the Monument valley overwhelm all of us, not just by its beauty but also by its vastness. The fragile pinnacles of rock are surrounded by miles of mesas and buttes, shrubs, and trees. This valley presents the magnificent colors and shapes. This is really a beautiful land. Natural process started way before, even before human existence. This Park was a lowland basin. For hundreds of millions of years, materials that eroded from the early Rock Mountains deposited layers of sediment which cemented a slow and gentle uplift, generated by ceaseless pressure from below the surface, elevating these horizontal strata quite uniformly one to three miles above sea level. This basin became a plateau. Natural forces like wind and water that eroded the land spent the last 50 million years cutting into and peeling away at the surface of the plateau. The simple wearing down of altering layers of soft and hard rock slowly revealed the natural wonders of Monument Valley today.

There are many landmarks in the Monument valley such as the East, West Mittens, the Merrick butte, the Totem pole, the North window overlook, the Three sisters, the Elephant butte, the Artist's point. If you come near to these landmarks and close your eyes, you will feel the existence of almighty or something powerful. It is a sacred place indeed. Sunrise in the early morning is a magical event in this valley. When first sunrays fall onto red rocks of the desert then entire place looks marvelous. You can enjoy different shades of red because light reflects in different angles from these curves of the canyon which were sculped over the years. The desert offers different vistas when sun is on the middle of the sky. The angle of the sun accents these graceful rocks, providing scenery that is simply awesome. The dry and dusty desert is wild in the winter days.

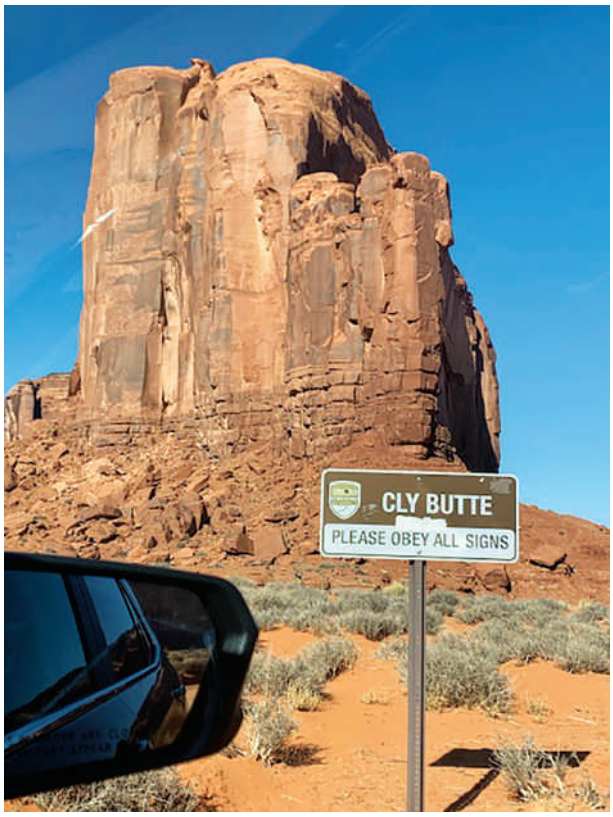

Monument valley is unique because of its archaeological and cultural intrigue. Navajo Tribes live in this land. It was amazing to explore that Novajo people's are 'luchi' lovers like us. They call it 'Frybread'. It's like unsweetened funnel cake, but softer and thicker with a lot of air bubbles and greasy. The size is bigger than our luchi and it is served by cutting into four pieces. Traditionally, it is served with honey or powder sugar. The ingredients are same as flour, salt, and water. They use lard also. One of the slices of the frybread has 700 calories and 25gm of fat. This food habit has caused diabetes pandemic and obesity in the reservations. Similarly, diabetes is very common in India because of the carbohydrate enriched food. The history of this frybread has attached with perseverance and pain. Navajo frybread originated 144 years ago, when the United States forced Red Indians living in Arizona to make the 300-mile journey known as the "Long Walk" and relocate to New Mexico. This new land that couldn't easily support their traditional staples of vegetables and beans. To prevent the indigenous populations from starving, the government gave them white flour, processed sugar, and lardthe makings of frybread and canned goods as well as.

There are some other cultural similarities among indigenous people (red Indians) and Asian Indians. During springtime, regional people of West Bengal celebrate folk festivals by doing song and dance festivals attached to the celebration of Lord Shiva during 'Charak' festival. The Charak, derived from the word 'chakra' or the wheel, represents the movement of the Sun. It is symbolized by a high pole, from which the devotees hang suspended from iron hooks, as a symbolic sacrifice to Lord Shiva. They take fasting all day and walk on the red-hot coal pieces with bare feet. Devotees pierce their tongue, skin of the upper chest or upper back with sharp objects. Similarly, these types of practice are present among red Indians in the United States. It is known as “Sun-dance”. When practiced, self-mortification was generally accomplished through piercing: mentors or ritual leaders inserted two or more slim skewers or piercing needles through a small fold of the supplicant's skin on the upper chest or upper back; the mentor then used long leather thongs to tie a heavy object such as a buffalo skull to the skewers. A dancer would drag the object along the ground until he succumbed exhaustion or his skin tore free. Piercing was endured by only the most committed individuals; it was done to ensure tribal well-being as well as to fulfill the supplicant's individual vow.

The Monument Valley portrays beauty of nature, packed with scenic vistas in all directions. This is the place where the Sky meets the Earth. It's more than just a visual treat, it uplifts your soul. These magnificent mountains teach us humility and gratitude the best. I immediately time travelled to the motherland when I touched and smelled the red soil.

Sneha Saha

Durga Puja In The City of Lights

You have just grabbed your morning coffee on an early run to the park when you see a truck loaded with bamboo sticks drive past you. Or perhaps, you roll down the car windows on your way to the office and see the first hoardings or posters being plastered around the city, boasting of the discounts on the latest trending outfits of the season. You suddenly realize that it's that time of the year again.

The streets of New Market and Gariahat slowly awake as the late morning welcomes the swarm of shoppers. With the twirl of a saree and the swish of a dupatta, each corner and shop adds its own flavor to the street. The cries of the bargaining customers and the shopkeepers shouting out the prices of their dresses reverberate through the streets. The Anandamela and Anandalok magazines are sold like hotcakes.

The air is saturated with the palpable magic of Durga Puja- a feeling which rushes through our veins, which blooms in the impatience of a father returning home for the pujas. It is there in the pride of son buying his mother a saree with his first salary, or in the smile of a mother clutching her newborn daughter's first dress. It is found everywhere; from the tears of a grandmother seeing her “grown up” granddaughter in a saree, to the frustration of the girl when her parents refuse to buy the “too short” dress. From the cheap drains to the grand pandals, it hides in every corner of the city.

It's these little things that make Durga Puja the biggest, grandest festival in India.

Durga Puja means the story of good and evil. The story of a time when monsters roamed the earth, when Gods were the superheroes who saved the day, a time of epic battles, dark curses, and ruthless bloodshed. It is the legend of a woman who had ten hands instead of a cape, a plethora of the “coolest” weapons, and the job of putting an irksome man in his place. Amidst the holiday spirit and festive cheer, Durga Puja also serves as a solemn reminder that under the lights and laughter, there lurks a grave evil in every corner of the society.

The meticulous ritual of counting down the days, stopping yourself from buying one more dress, peeping through the holes in the curtain to catch a glimpse of the idol - all build to up that day when it's not your stupid alarm or mother's yell which wakes you up in the morning. When the first rumble of the 'dhak' creeps into your room with the first rays of sunshine, your heart knows it has begun even before your eyes have opened.

Saptami means rushing to the pandal to see the 'Kolabou Snan' and gigging at the idea of Lord Ganesha marrying a banana tree. Ashtami is when the streets are thronging with school girls fixing the hem of their sarees and clicking pictures, and mothers forcing their sons to wear Punjabi for a day. It means opening one eye during offering pushpanjali to the Goddess and immediately closing them under the glare of Pundit.

At night, under the twinkling lights draped all over the city, the streets teem with the swarm of 'pandal hoppers'. The midnight hour is full of people standing in long queues outside the large, grand pandals, clicking aesthetic selfies inside the small, artsy pandals and winning cheap prizes in fairs. The euphoric madness, the laughter, continues throughout the night and up until the first rays of the sun bleed through the sky.

The sadness sinks in during Nabami- when the clock ticks a little too fast and the hours slip by like grains of sand through our fingers. People find an excuse to linger behind in the pandals and soak up the remnants of Maa Durga's presence before she embarks on her journey back to the majestic, snow-clad peaks of the Kailash Mountain.

And then Dashami is the time when we cling onto the last seconds of this year's puja . It is a

bittersweet moment, tender and poignant, when the face of the Goddess finally disappears under water to the cries of “Asche Bochor Abar Hobe.” With the crimson hues of the setting sunset playing with soft arches of the Howrah Bridge, the entire city is drenched in the colours of 'sindoor khela' and the madness of the 'dhunuchi dance.' Amidst the hues of vermillion, the blaring loudspeakers and streets full of people dancing their hearts out, the last hours of puja dwindle to an end, but not before leaving behind a trail of hope, wishes and plans for next year in its wake.

Pritisha Sarkar

Member Directory

Last name	Name	Email address	Address	City	State	Zip
Bandyopadhyay	Debalina/Krisanu	debalina@umich.edu, krisanu@umich.edu	373 Harvard Street	Canton	MI	48188
Bandyopadhyay	Kisa/Babu	kisa_b@yahoo.com, babubandy@yahoo.com	505 Amherst Circle	Saline	MI	48176
Banerjee	Alokparna / Anupam	abanerjee.wayne@gmail.com	21510 Green Hill Rd APT 346	Farmington Hills	MI	48335
Banerjee	Debashis/Tanima	debasishbanerjee2007@gmail.com, tanima@umich.edu	3104 Spring Hollow ct	Ann Arbor	MI	48105
Bhadra	Dr Utpal	rnaiindia@gmail.com		Ann Arbor		
Bhattacharya	Namita/Bhanu	bhanu_42519@yahoo.com	42519 Woodwind Ln	Canton	MI	48188
Bhowmick	Mithun/Priti	mithun.bhowmick@gmail.com	3170 Bloomfield Ln	Auburn Hills	MI	48326
Biswas	Tania/Kuntal	taniabiswas123@gmail.com, kuntalbiswas123@gmail.com	18691 Innsbrook Dr #2	Northville	MI	48168
BT/Banerjee	Vardaraj/Rajashree	btvardaraj@yahoo.com	36532 JEFFERSON CT 12210	Farmington Hills	MI	48335
Chakraborty	Niladri/Semanti	meniladri@gmail.com	4197 3 oaks Dr., Apt#4B	Troy	MI	48098
Chatterjee	Bhaskar	bkchitk@gmail.com	1104 Maiden Lane Court	Ann Arbor	MI	48105
Choudhary	Lalita/Ajay	ajaychoudhary@hotmail.com	42344 Metaline Dr	Canton	MI	48187
Chowdhury	Shayanti / Rajesh	rajesh.choudhury@gmail.com	27147 Victoria Road	Novi	MI	48374
Das	Amit	ghoseamit@hotmail.com	1145 Fox Hill Drive Apt 102	Monroeville	PA	15146
Das/Mollick	Binoy/Monidipa	dbinoy@gmail.com	19001 Heather Ridge Dr	Northville	MI	48168
DasGupta	Anindita DasGupta	aninditadg14@gmail.com	42317 Saratoga Circle	Canton	MI	48187
Dastidar	Anamika/Abhijit	abhijit_dastidar@hotmail.com, adutta1@ford.com, anamikadastidar@gmail.com	1655 Northbrook Ct	Canton	MI	48188
Datta	Champa					
Dattagupta	Fanny/Twish	fanny_joy@yahoo.com, fannyraina@yahoo.com	600 Concord Drive	Canton	MI	48188
Deb	Arpita/Aniruddha	am241@yahoo.com, debani@umich.edu	2872 Aspen Ridge Drive	Ann Arbor	MI	48103
Deb	Smita/Kaushik	kaushikdev@gmail.com, ksmitadeb@gmail.com	23091 Sagebrush #102	Novi	MI	48375
Dey	Subhasis/Shangrila	shangriladey@hotmail.com	20509 Northville Place Drive, # 2005	Northville	MI	48167
Dutta	Bhaswar/Sharmistha Saha	bhaswar.dutta@gmail.com	1416 Astor Ave	Ann Arbor	MI	48104
Ganguly	Tania/Snehasis	snehasis_ganguly@yahoo.com, tania_ganguly@yahoo.com	47286 North Pointe Drive	Canton	MI	48187
Ghose	Amit	ghoseamit@hotmail.com				
Ghosh	Indrani/Dipak	ghosh_dipak@hotmail.com, ghosh_indrani@hotmail.com	38253 Remington Park	Farmington Hills	MI	48331
Ghosh	Mahua/Abhijit	abhij98@yahoo.com, ghosha@umich.edu	2733 Deake Ave	Ann Arbor	MI	48108
Ghosh	Mithu/Amiya	demithu@yahoo.com, ghoshamiya@yahoo.com	4079 Crystal Creek Drive	Ypsilanti	MI	48197
Ghosh	Piki/Rana	ghosh111@gmail.com, pompy_s@yahoo.com	22357 Hazelton Ct	Novi	MI	48374
Ghosh / Bagchi	Neha / Samik	nehughosh26@gmail.com, samikbagchi@gmail.com	2624 Elderberry Dr	Okemos	MI	48864
Guha	Ranjana/Debojit	ran_guha@yahoo.com	729 Prospect Hill Street	Canton	MI	48188
Halder	Soumi Das & Mridul	mridulhalder2008@gmail.com	27727 Rudgate Blvd.Apt # 5	Farmington Hills	MI	48334

Last name	Name	Email address	Address	City	State	Zip
Joshi	Devang/Ankita	apaul6633@gmail.com	4152 calder lane	Aurora	IL	60504
Karmakar	Mrinmoy	mrinmoy.mca04@gmail.com	50725 Baileys Landing	Canton	MI	48187
Kundu	Kadambari/Sourav	sourav.kundu@live.com , kadamborib@gmaik.com	43285 Citation	Novi	MI	48375
Mahanta	Rituparna/Subrata	mahanta@gmail.com, subrataindia02@yahoo.com	45066 Weymouth Drive	Canton	MI	48188
Mahanta	Sumi/Sadhan	smahanta53@hotmail.com, chaitali53@gmail.com	45341 Seabrook dr	Canton	MI	48188
Mitra	Mowsumi/Amitabha	mowsumichakraborty@yahoo.com	1486 Middlewood Drive	Saline	MI	48176
Mondal	Suman/Ankita	sumantrek@gmail.com, ankitadas2131@gmail.com	6930 N Inkster Road, 201G	Dearborn Hts	MI	48127
Mukherjee	Shakti/Shampa	s_mukerjee@hotmail.com, shampa_mukerjee@hotmail.com	298 Armitage Drive	Canton	MI	48188
Mukherjee	Sandip/Soma	iamsumimukherjee@gmail.com, mukherjee.iam@gmail.com	24528 Bashian Dr	Novi	MI	48375
Mukherjee	Abhishek/Ranita	ovishek614@gmail.com , abhi65205@gmail.com	6627 Millridge Cir, 6	DUBLIN	OH	43017
Mukherjee	Malika mukherjee	mchaudhuri@oakland.edu	5266 Creekmonte Drive	Rochester	MI	48306
Natasha Ghose	Natasha	nghose23@gmail.com				
Pal	Chayanika/Dipankar	chayanikapal@gmail.com	8028 Claude Ct.	Sylvania	OH	43560
Pharikal	Debadeep	debadeep.pharikal@gmail.com, itsbips@gmail.com	15885 Goddard Rd Apt 208	Southgate	MI	48195
Rakhit	Sabita/Deb	sobi_deb@yahoo.com	30244 Sterling Dr.	Novi	MI	48377
Ray	Deepika/Santanu	rayline@sbcglobal.net	2092 Hendrie	Canton	MI	48187
Ray	Suchitra/Debashish	debashishrays@gmail.com, ray.suchitra@gmail.com	2412, Somerset Blvd., Apt 203,	Troy	MI	48084
Ray	Indranil/Manisha	indranil.ray2007@gmail.com, Manisha.chakraborty23@gmail.com	11 N Plaza Blvd 393	Rochester Hills	MI	48307
Roy	Anjali/Biplab	vipluv_R@yahoo.com	48790 Greenwich Cir.	Canton	MI	48188
Roy	Mitra/Partho	mroy797@yahoo.com	46430 Brookridge Dr.	Canton	MI	48187
Roychoudhury	Selvi/Sanjib	chowdhuryus@yahoo.com	31366 Pickford Ave	Livonia	MI	48152
Saha	Papiya/Debashis	debsaha_1971@yahoo.com, papiyasaha_1972@yahoo.co.in	22238 Solomon Blvd, Apt # 126	Novi	MI	48375
Sahu	Jatin	pikjt8@gmail.com	39405 WINDSOME DR	Northville	MI	48167
Sarkar	Ananya/Anirban	anirban77sarkar@gmail.com, ananyablr@gmail.com	49138 Hawksburry Rd	Canton	MI	48188
Sarkar	Norma/Ashish	adsarkar48@gmail.com	1918 Wentworth	Canton	MI	48188
Sarkar	Sandip/Sampa	sarkarsrss@yahoo.co.in	3129 Frankton	Troy	MI	48083
Sarkar	Abhijit/Sujata	axsarkar@gmail.com, sujata_c@hotmail.com	3539 Myrtle Drive	Okemos	MI	48864
Sarkar	Ashish and Norma	Email: adsarkar48@gmail.com	1918 Wentworth Drive	Canton	MI	48188
Sarkar	Jhumpa/Pritam	pritam123sarkar@gmail.com ; jhumpa123das@yahoo.com	35091 Drakeshire Pl, 203	Farmington Hills	MI	48335
Sarkar	Dr Subrata	subratasarkar@hotmail.com				
Sen	Jayeeta/Jishnu	senjayeetajishnu@gmail.com	5157 Royal Park Circle	Ann Arbor	MI	48108
Shankar	Anushree/Vishnu	anushree_shankar@yahoo.com, vish_ace@yahoo.com	4618 Shoreview Drive	Canton	MI	48188
Talukder	Mousumi/Ashim	mousumi_t@yahoo.com, ashim_t@yahoo.com	26417 Crestwood Dr.	Novi	MI	48374
Thakurta	Sahana/Kuntal	kthakurta@hotmail.com, shahanathakurta@yahoo.com	3472 Ashburnam Road	Ann Arbor	MI	48105
Tripathy	Nilamadhaba	tripathy.nil@gmail.com	2904 E Eisenhower Pkwy	Ann Arbor	MI	48108

25 YEARS LEADING THE MORTGAGE RATE IN MICHIGAN

- THE LOWEST RATES IN MICHIGAN OVER THE LAST 25 YEARS
- HIGH QUALITY WORK FROM START TO FINISH, GUARANTEED TO CLOSE ON TIME
- 24/7 SUPPORT ALL THE WAY TO CLOSING
- FREE IN-HOUSE MORTGAGE CONSULTATION AND PRE-APPROVAL
- WE OFFER: CONV, VA, FHA, JUMBO, NO INCOME, FOREIGN NATIONAL
- WE WILL BEAT ANY RATE IN THE COUNTRY

A Best Financial Corporation

NMLS #138461

Contact: Bing Guo NMLS #138564
Phone: 734-476-4427
Address: 42180 Ford Rd Suite 307, Canton, MI 48187
Web: www.abestfinancial.com
Email: rt48bg@gmail.com

SWAJAN

Swajan of Great Lakes